নারীর কথা

NARIR KATHA

THE HUNGER PROJECT Bangladesh

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

নারীর কথা-১০

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৫ উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদনায়
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

৮ মার্চ, ২০১৫

THE HUNGER PROJECT

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

Narir katha 10
Collected writings on the occasion of International Woman's Day
Published by: The Hunger Project
3/7 Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207
Tel: 8802-913-0479
Website: www.thp.org and www.thpbd.org

সূচিপত্র

* নারীবান্ধব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান রাশেদা আখতার
জিল্লুর রহমান

* নিরলস মানব সেবায় রত আফরোজা কুসুম
স্বপন সিকদার

* নারী জাগরণের একনিষ্ঠ কর্মী হাসিনা আক্তার
জিল্লুর রহমান

* নাছিমা জামান: পুরুষতন্ত্রকে জয় করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান
রাজেশ দে

* বড় পরিসরে সমাজ উন্নয়নের প্রত্যাশা হাসমিন লুনার
পলাশ মন্ডল

* রশিদা বেগম: গৃহবধূ থেকে আজ জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি
রাজেশ দে

* বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তাসলিমা সুলতানা খানম নিশাত
তুহিন আলম

* নিবিড় জনসংযোগের মাধ্যমে সাফল্যের শিখায় মরিয়ম বেগম শেফা
আসির উদ্দীন

* মর্জিনা আক্তারের বিশ্বাস: মানসিকতার উন্নয়নই সত্যিকার উন্নয়ন
আসির উদ্দীন

* সময়ের সাহসী সৈনিক মুর্শিদা বেগম রুপালী
মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

* অন্ধকারে আশার আলো মোছাঃ জিয়াসমিন আক্তার
সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন

* জাহানারা রোজী: একজন সফল সংগঠক ও জনপ্রতিনিধি
এ এন এম নাজমুল হোসাইন

* নারীদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করতে সদা সচেষ্ট কানিজ ফাতেমা
সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন

* নারীদের সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করার স্বপ্ন বুলু রায় গাঙ্গুলীর
মাহবুব-উল-আলম বুলবুল

* অ্যাডভোকেট পারভিন খানম: একটি প্রেরণার নাম
মোঃ মনিরুজ্জামান মোল্লা

* শেকড় থেকে শিখরে আজ লক্ষী রাণী সরকার
নেসার আমিন

* মেধা ও নিরলস পরিশ্রমে বিশ্বাসী নাসরীন আক্তার শারমিন
মনিরা খাতুন

* শৈশবের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিবেদিত শামীম আরা খাতুন
হেলাল উদ্দিন ও আসাদুল ইসলাম

* পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নিবেদিত লাইলা আরজুমান বানু
হেলাল উদ্দিন

* পাংশার সাহিদা আহম্মেদ: অপরাজেয় এক জনপ্রতিনিধি
শেখ আব্দুল খালেক

* নিরক্ষর ও বাল্যবিবাহমুক্ত উপজেলা গড়তে চান হেলেনাজ তাহেরা
মাইনুল ইসলাম

* ফরিদা ইয়াসমিন: জীবন সংগ্রামে জয়ী এক জনপ্রতিনিধি
মাইনুল ইসলাম

* ফৌজিয়া খানম: দক্ষিণ চট্টলার অগ্নিকন্যা
মাইনুল ইসলাম

* অপরাজিতা তাপসীর চোখে স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন
মেহের আফরোজ মিতা

* মানুষের সেবায় সদা সচেষ্ট রেহানা বেগম
রিয়াজ মোর্শেদ

* ডালিয়া নাসরিনের ফুল হয়ে সুবাস ছড়ানোর গল্প
সোহানুর রহমান সোহান

* জোসনা খাতুন: ক্ষমতায়িত নারীর এক উজ্জ্বল উদাহরণ
মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল

* খন্দকার নুরুন নাহার: গৃহিণী থেকে সিটি করপোরেশনের কমিশনার
মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল

* তাহমিনা খাতুন: নিজ যোগ্যতাবলে প্রতিষ্ঠিত এক জনপ্রতিনিধি
আশরাফুল ইসলাম সরকার

সম্পাদকীয়

বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীরা বিভিন্নভাবে বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার হয়। এ রকম একটি অবস্থায়ও বাংলাদেশে নারীরা যেভাবে একের পর এক নিজ যোগ্যতাবলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে তাতে সমাজের নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ফলে দেশের অনেক ক্ষেত্রই সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা মনে করি, স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন আশাব্যঞ্জক পর্যায়ে পৌঁছেছে। উৎপাদনমুখী সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। গোবাল জেন্ডার গ্যাপ-এর প্রতিবেদন (২০১৩) অনুযায়ী, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকে সপ্তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও অর্থনীতিতেও নারীর অবদান ক্রমশ বাড়ছে। নারীদের এ এগিয়ে যাওয়া প্রমাণিত করে যে, বাংলাদেশের নারীরা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে, একই সাথে হতে পারে উন্নয়নের অংশীদার। আর নারীদের এ অগ্রগমনে অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

একদল সচেতন নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণ' প্রদান এবং নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিতকরণ ও তাদের নেতৃত্বকে বিকশিত করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করে। উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এক দল নারীকে সংগঠিত, ক্ষমতায়িত ও জাগ্রত করার ব্রত নিয়ে গড়ে ওঠে 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক', যার মূল লক্ষ্য নারীরা যেন নিজেরাই সর্বক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের মূল রূপকার হয়ে উঠতে পারে। এই নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের বলিষ্ঠ করে তোলার সুযোগ প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে তৃণমূল থেকে উঠে আসা এক নতুন ধরনের নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে, যারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের সহায়ক এবং তাদের অনেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। তারা নির্বাচিত হয়েছেন জাতীয় সংসদ নির্বাচন-সহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচনে। এ গ্রন্থে প্রকাশিত গল্পগুলো তারই প্রামাণ্য দলিল।

আমরা মনে করি, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে যুক্ত করা গেলে একটি পরিবার তথা সমগ্র জাতি উপকৃত হয়। কিন্তু নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে উপরোক্ত সবগুলোরই দ্বার উন্মোচিত হয়।

'নারীর কথা' একটি ধারাবাহিক সংকলন। ২০০৬ সালে এর প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল। সময়ের ধারাবাহিকতায় সাফল্যের সোপান বেয়ে দশম বারের মত ২৯ জন নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধির (সিটি করপোরেশন ও উপজেলা পরিষদ) সফলতার গল্প নিয়ে প্রকাশিত হলো নারীর কথা-১০।

আমরা মনে করি, সফলতার এ গল্পগুলো প্রকাশের মাধ্যমে সমাজের অন্যসব নারীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন। নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হবেন এবং সমাজের উন্নয়নে আরও বেশি পরিমাণে তারা ভূমিকা রাখতে পারবেন।

আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের এ সকল সাফল্যগাঁথা সংগ্রহ করেছেন।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি'র 'বাংলা বানান–অভিধান' (তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫) অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রন্থে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ও মুদ্রণপ্রমাদ থাকলে পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ, বিশেষ করে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ গল্পগুলো যদি অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে, তবে সেটিই হবে এ গ্রন্থের সাফল্য।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

নারীবান্ধব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান রাশেদা আখতার

জিল্লুর রহমান

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১'র মুক্তি সংগ্রাম পর্যন্ত অনেক নারীই জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। পশ্চাৎপদতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন অনেক নারী। কিন্তু তারপরও নারীর জন্য পাওনা অধিকারগুলো অর্জিত হয়নি আজও। ঘরে বাইরে নারীর এই অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ও সংগ্রামের পথ ধরে আজকের বাংলাদেশে যে ক'জন নারী চেনা পথের বাইরে এসে নতুন পথ তৈরির সংগ্রাম চলমান রেখে এগিয়ে যাচ্ছেন– তাদেরই একজন আমাদের সবার পরিচিত মুখ, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি রাশেদা আখতার।

১৯৬৪ সালের ১৩ মার্চ ফেনী জেলার শর্শদি গ্রামে তার জন্ম। বাবার ব্যবসায়িক সূত্রে শৈশব ও কৈশোর কেটেছে চট্টগ্রামে। নানা মোফাজ্জল আলী ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন অগ্রসৈনিক। ছোটবেলা থেকে শিশু সংগঠনে যুক্ত থাকা ও নানার সাহচর্যে থাকার কারণে মানুষের প্রতি মমতা, দেশপ্রেম ও দায়বদ্ধতা নিয়ে বড় হবার সুযোগ হয় রাশেদার। বাবা কোব্বাদুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। ১৯৭৩ সালে বাবার অকাল মৃত্যুতে মা রাহেলা বেগম সাত সন্তান নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। অসময়ে জীবনের সেই ছন্দপতনে মা কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাবার শাসন ও মায়ের আদর-স্নেহ দিয়ে তাদের বড় করেন। সাত ভাই-বোনের মধ্যে রাশেদা ছিলেন দ্বিতীয়। লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র অভিভাবক এর অভাবে স্কুলের বৈতরণী পার হবার পূর্বেই মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়।

১৯৮০ সালে এসএসসি পাস করার পর শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধ পরিবেশে লেখাপড়া করার স্বপ্ন প্রায় মুছেই গিয়েছিল। সংসারের জোয়াল টানতে গিয়ে রান্না ঘরেই কেটে গেছে জীবনের অনেকগুলো বছর, ততদিনে তিনি দু সন্তানের জননী। স্বামীর সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততা, আর্থিক টানাপোড়েন, নিজের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ, সন্তানদের ভবিষ্যত ও আত্মকর্মসংস্থানের চিন্তা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। যৌথ পরিবারের বাধা ডিঙিয়ে সন্তানদের নিয়ে শহরে আসার ভাবনা তাকে পেয়ে বসে এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় সন্তানদের নিয়ে কুমিল্লা শহরে একরুমের একটি বাসায় ওঠেন।

পরিবারের ভরণ-পোষণ, সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ, সেইসাথে স্বামীর রাজনীতি নিয়ে পড়ে থাকা, এসবে নিজেকে কিছুতেই ভেঙে পড়তে দেননি রাশেদা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ নেন তিনি। হাতের কাজ শেখেন, ঠোঙ্গা তৈরি করা শেখেন। কিন্তু কিছুতেই মনটাকে স্থির করতে পারেন না, মনের মধ্যে শুধু স্বপ্ন– নিজের লেখাপড়াটা আবার শুরু করা। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সন্তানদের পড়ার ফাঁকে গোপনে গোপনে নিজের লেখাপড়াটাও আবার শুরু করেন। মায়ের দেয়া সেলাই মেশিন আর সাহসকে পুঁজি করে এসএসসি পাশের পাঁচ বছর পর ১৯৮৫ সালে এইচএসসি পাস করেন রাশেদা আখতার।

জীবনটা ফুল বিছানো ছিল না, কাঁটা ভরা দুর্গম পথ পাড়ি দিতে গিয়ে কখনও স্কুলের চাকুরি, কখনও সেলাই শেখানো, কখনও টিউশনি– এভাবেই সংসার ও সামাজিকতা নিয়ে দিন পার হয়েছে। ছোট সন্তানের ম্যানিনজাইটিসে আক্রান্ত হওয়ায় স্কুলের চাকুরিটা ছেড়ে দিতে হয় রাশেদাকে। দু বছরের দীর্ঘ চিকিৎসার পর সন্তান ভাল হয়ে ওঠার পর নিজের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা চিন্তা করে সরকারি চাকুরি লাভের প্রত্যাশায় ভর্তি হন পিটিআই ট্রেনিং-এ। কিন্তু আর্থিক সংকটের দরুন তথা সন্তানদের লেখাপড়ার খরচের কথা চিন্তা করে তা চালিয়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক ডামাঢোলে স্বামীর কারাভোগ, পারিবারিক ও সামাজিক বাধা ইত্যাদি সত্ত্বেও পুনরায় লেখাপড়া শুরু করার জেদ চাপে রাশেদার মাথায়। একদিকে জীবন যুদ্ধের লড়াই, সমাজের বাঁকা চোখ ও সন্দেহ, যৌথ পরিবারে অন্য সদস্যদের অনাগ্রহ, অপরদিকে মা ও

বড় বোনের একান্ত উৎসাহ এবং নিজের মনোবলের ওপর ভর করে রাশেদা এইচএসসি পাসের প্রায় ১০ বছর পর ১৯৯৫ সালে বিএ পাস করেন। এ এক বিরাট অর্জন, যা তাকে সমাজে দাঁড়াবার শক্তি জুগিয়েছে। ততদিনে তাঁর চার সন্তানও উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডিতে ঢুকে পড়েছে। তার সাথে যখন কথা হচ্ছিল তখন তিনি অশ্রুসজল চোখে তার এই উদ্যমের কৃতিত্ব ও কৃতজ্ঞতা সন্তানদের প্রতি নিবেদন করেন। তিনি বলেন, আমার সন্তানরা আমার বন্ধু। আমার বর্তমান আমি হওয়ার পেছনেও সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে তারা। ওদের টিফিনের পয়সা, ওদের জমানো টাকা এবং ওদের মিতব্যয়ী জীবনের সকল সাধ্য তারা আমাকে উজাড় করে দিয়েছে।

কীভাবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সাথে যুক্ত হলেন? – এ প্রশ্ন করতেই চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রাশেদা আপার। তিনি জানান, তার স্বামী একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা, তার বাবা ছিলেন সেই যুদ্ধেরই সংগঠক। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন, স্বামী ও পিতা যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন তা অনেকটা অধরাই রয়ে গেছে। চারদিকে সামাজিক অস্থিরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, আদর্শহীন রাজনীতি তাকে তার সন্তানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করে তুলছিল দিন দিন। ঠিক সেই সময় ২০০০ সালে একটি জাতীয় দৈনিকে ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর লেখা নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক একটি লেখা পড়ে প্রচণ্ড আবেগে আপ্লুত হন তিনি। তার কয়েক দিন পর স্থানীয় একটি দৈনিকে ড. মজুমদার এর কুমিল্লা বার্ড এ আসার সংবাদ পেয়ে রাশেদা আপা তার বড় ছেলে শাওনকে সাথে নিয়ে ছুটে যান ড. মজুমদার স্যার-এর সাথে দেখা করতে। আন্তরিক আগ্রহ আর উদ্দীপনা দেখে ড. বদিউল আলম মজুমদার তাকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। রাশেদা আপা জানান, স্যারের আমন্ত্রণে অনুপ্রাণিত হয়ে ওই বছরই (২০০০ সাল) কুমিল্লার বার্ড-এ অনুষ্ঠিত ২৯তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন রাশেদা আখতার। সেদিনের সেই উজ্জীবক প্রশিক্ষণ তার বিবেকের বন্ধ চোখ খুলে দেয়; ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার চেতনা নাড়া দেয় তার হৃদয়ের গভীরে। একজন নাগরিক হিসেবে সমাজের প্রতি তিনি দায় অনুভব করেন। এরপর পাল্টে যায় তার পথচলা। উজ্জীবক প্রশিক্ষণে যে আলোর সন্ধান তিনি পেলেন তা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলোর মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ছুটে যান মানুষের দ্বারে দ্বারে।

কুমিল্লা শহরের রেইসকোর্সের বস্তিতে বসবাসকারী আম্বিয়া, কুলসুম, কাজল ও সবুরা এসব অসহায় নারীরা বাসা বাড়িতে ঝি-এর কাজ করতো। রাশেদা তাদের নিয়ে গড়ে তুললেন মুষ্টি চাল সমিতি, শেখালেন প্রতিদিনের খাবার থেকে অল্প অল্প চাল জমিয়ে কীভাবে সঞ্চয় করতে হয়। রেহানা, হোসনা, মিলন ও রুফিয়াদের শেখালেন ঠোঙ্গা বানানো, চিপস তৈরি এবং কাজল-কে উৎসাহিত করলেন চায়ের দোকান খুলে বসতে। এভাবে যারা বস্তির অন্ধকার জীবনে হারিয়ে যাচ্ছিল, সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাদের বেঁচে থাকার সম্মানজনক পথ দেখালেন রাশেদা আখতার। মুষ্টি চাল সঞ্চয়, চিপস তৈরি, কাঁথা সেলাই, ঠোঙ্গা বিক্রির টাকা দিয়ে গড়া সমিতির দু লাখ টাকা তাদের জীবনটাকে পাল্টে দেয়ার ভিত গড়েছে। আজ সেসব নারীরা স্বনির্ভর, তাদের সন্তানদের প্রায় সবাই লেখাপড়া করছে।

শুধু অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নয়; রাশেদা আখতার নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, পরিকল্পিত পরিবার, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের কুফলসহ নানা বিষয়ে সচেতন করে তুলতে লাগলেন তার চারপাশের মানুষদের। অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহ যোগানো, আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের সংগঠিত করার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসকে আরও অধিকতর বিকাশের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অষ্টম স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক (টিওভিটি) প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এবং সে বছরই মোস্তফা জব্বার-এর আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন তিনি, যা তার জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত।

এরপর নিজ গ্রামে ও ইউনিয়নে দুটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বোধকে জাগিয়ে তোলেন তিনি। প্রশিক্ষণ শেষে ৯৫ জন একটি করে গাছ লাগিয়ে তাদের উজ্জীবক জীবন শুরু করেন, এতে গ্রামবাসীরাও উদ্বুদ্ধ হয়। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কালো টাকা এবং সন্ত্রাসীদের প্রভাব দূর করতে জনমত গড়ে তোলার পাশাপাশি সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত করার ব্যাপারেও জনগণকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন রাশেদা। পারভীন আক্তার নামক একজন উজ্জীবক-কে ইউপি সদস্য নির্বাচিত করে গ্রামবাসী। পারভীনের নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে খরচ হয় মাত্র ৮২৫ টাকা, আর তা সম্ভব হয় শুধুমাত্র রাশেদা আখতার-এর ভূমিকা কারণেই।

২০০২ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের দশ নারী সদস্যের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভারতের ব্যাঙ্গালুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে যোগদান করার সুযোগ লাভ করেন রাশেদা আখতার। ২০০৪ সালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত ২৪ জন নারীসহ মোট ৫০ জন নারীকে নিয়ে রাশেদা গড়ে তোলেন কুমিল্লা জেলা কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম। এই ফোরাম-এর মাধ্যমেই কুমিল্লায় প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়।

এরপর আর থমকে দাঁড়াননি রাশেদা আখতার। প্রবল আত্মবিশ্বাস, অবিচল আস্থা, নিরলস পরিশ্রম তাকে এগিয়ে নিয়েছে তার মত আরও উজ্জীবক তৈরির সুপ্ত বাসনাকে সার্থক করতে। তার একক প্রচেষ্টায় 'নিজেকে জয় করো, অন্যকে যুক্ত করো' – এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ২০০৪ সালে ১৪৭ জনের অংশগ্রহণে কুমিল্লা আইন কলেজে অনুষ্ঠিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণটি ছিল দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর জন্য স্মরণীয় একটি প্রশিক্ষণ। এরপর কুমিল্লার রানীরকুটিরে অপর একটি প্রশিক্ষণে অংশ নেন আরও ৮৭ জন, যে প্রশিক্ষণে রাশেদা আখতার-এর চার সন্তানও অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণের পর তার দু সন্তান শাওন ও সূবর্ণা ইয়ুথ লিডার হিসেবে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার-এর কাজের সাথে যুক্ত হয়। বর্তমানে তাঁর বড় মেয়ে আফরোজা হাসান সূবর্ণা বিবিএ পাশ করে একটি বুটিকস হাউজে লগ অন প্রোপাইটার এবং বড় ছেলে আশরাফুল হাসান শাওন এমএসএস পাশ করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন-এ প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। আরেক মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং-এ তৃতীয় বর্ষে এবং ছোট ছেলে আসিফুল হাসান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে।

২০০৬ সালে রাশেদা আখতার নিজেকে আরও বিকশিত করার লক্ষ্যে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে (১৬তম ব্যাচে) অংশ নেন। এরপর থেকে তৃণমূলের নারীদের জাগিয়ে তোলা, তাদের অধিকার সচেতন করে তোলাসহ নারীর অবস্থা এবং অবস্থানের পরিবর্তনে তার বিরামহীন পথচলা আজকের দিনেও রয়েছে অব্যাহত।

প্রবল আত্মবিশ্বাস, অবিচল আস্থা, নিরলস পরিশ্রম তাকে এগিয়ে নিয়েছে তার মত আরও রাশেদা তৈরির সুপ্ত বাসনকে সার্থক করতে। অপরিণত বয়সের বিয়ের জের, চারটি সন্তানের জন্মদান, শারীরিক সংকট ও জটিল অপারেশন – সবমিলিয়ে দীর্ঘ অসুস্থতা, আবার চাকুরি থেকে বিদায় নেয়া, তারপরও রাশেদা আখতার দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিলেন।

তৃণমূলের সাধারণ মানুষের ব্যাপক আগ্রহ, আরও বড় পরিসরে কাজ করার সুযোগ প্রভৃতির জন্য শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বল অর্থনৈতিক সামর্থ্য সত্ত্বেও পিতৃতুল্য ড. বদিউল আলম মজুমদার এর কাছ থেকে পাওয়া সাহস, স্বামীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাসা ও দাবির প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত চৌদ্দগ্রাম উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে এবং জনসাধারণের ভালবাসায় প্রজাপ্রতি প্রতীক নিয়ে ৭২,৯৭৪ ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হন।

নিঃস্বার্থ ও নিবেদিতভাবে একটি সামাজিক আন্দোলনকে যেভাবে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আন্তরিকভাবে লেগেছিলেন রাশেদা আখতার, ঠিক সেভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন তিনি। ২০১০ সালে নোয়াখালীর দত্তের হাট বিনোদপুরে এনআরডিএসে নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যানদের নিয়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়, যেখানে রাশেদা আখতার প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। একইসঙ্গে এ প্রশিক্ষণ তার জানার পরিধি আরও বাড়িয়ে দেয়, তিনি পান সংগঠন পরিচালনা করার দক্ষতা ও অনুপ্রেরণা। এর ফলশ্রুতিতে সারাদেশের ভাইস চেয়ারম্যানদের নিয়ে রাশেদা আখতার গড়ে তোলেন কেন্দ্রীয় উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান সমন্বয় পরিষদ, বাংলাদেশ। একসময় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে সংগঠনটি। পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যানরা নিজেদের নিয়ে আলাদা জোট বাঁধলেন। কিন্তু দমে যাননি রাশেদা আখতার। নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের নিয়ে গঠন করলেন 'উপজেলা পরিষদ অ্যাসোসিয়েশন অব নারী ফোরাম'। ড. বদিউল আলম মজুমদার ও ড. তোফায়েল আহম্মেদ এই দু জন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ পিতার মত স্নেহ নিয়ে এই ফোরাম-এর পাশে দাঁড়ালেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১০ সালে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে চট্টগ্রাম বিভাগের সকল মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের (৫৭ জন) অংশগ্রহণে 'স্থানীয় সরকাব্যবস্থা' বিষয়ক দু দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ড. বদিউল ও ড. তোফায়েল মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের কাজের পরিধি, পরিষদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। একইসঙ্গে নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রেখে কাজ করার আগ্রহকে সম্মানের সাথে গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা। পরবর্তীতে স্বেচ্ছাব্রতী হয়ে ৩৭ জন ভাইস চেয়ারম্যান ও ৪৫ জন ইউপি নারী সদস্য বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত, 'উপজেলা পরিষদ অ্যাসোসিয়েশন অব নারী ফোরাম' ২০১৩ সালে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে নিবন্ধন লাভ করে।

রাশেদা আখতার শুধুমাত্র একজন জনপ্রতিনিধিই নন, একইসাথে তিনি একজন সফল সংগঠকও বটে। ২০১২ বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর চতুর্থ জাতীয় সম্মেলনে তিনি এ নেটওয়ার্ক-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সভাপতি হিসেবে তিনি শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া সফর করা এবং সেখানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্মেলনে যোগদান করার সুযোগ পান। বিশেষ করে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি সিম্পোজিয়ামে 'বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করার সুযোগ পান তিনি। ২০১৩ সালে তিনি সুবিধাবঞ্চিত নারীদের নিয়ে কাজ করার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার প্রবর্তিত 'জয়িতা' পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৪ সালে বাংলাদেশের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের হাত থেকে বাংলাদেশ উইমেন এলায়েন্স লিডারশিপ-এর ফেলোশিপ পদক গ্রহণ করেন।

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ উপজেলা নির্বাচনে রাশেদা আখতার পুনরায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমর্থনে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৮২৫ ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বারের মত চৌদ্দগ্রাম উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। একই বছরের অক্টোবরে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর জাতীয় জাতীয় সম্মেলনে তিনি আবারো এ নেটওয়ার্ক-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্প্রতি রাশেদা আখতারকে দলীয় কাউন্সিলে সর্বসম্মতভাবে চৌদ্দগ্রাম

উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দলের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমকেই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

রাশেদা আখতার-এর সক্রিয় সহযোগিতায় ইতোমধ্যে তার নিজ উপজেলায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। দাতা সংস্থা সুইস ডেভেলপমেন্ট ফর কো-অপারেশন-এর (এসডিসি) সহায়তায় 'অপরাজিতা' প্রকল্পের সহায়তায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও তাদের দায়িত্ব সচেতন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে ইউপি'র সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা আগামী ইউপি নির্বাচনে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উৎসাহিত হচ্ছেন।

রাশেদা আখতার উপজেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা, পরিষদের সাধারণ সভা পরিচালনা, জেলা সভায় যোগদানসহ নিজ এলাকার সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তদারকি করছেন। এছাড়া সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর কুমিল্লা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। নারীদের আইনি সহায়তার পথকে সুগম করতে নিজের এত ব্যস্ততার মধ্যেও ২০১৪ সালে রাশেদা আখতার আইন বিষয়ে লেখাপড়া করতে ভর্তি হয়েছেন ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, 'লেখাপড়ার কোনো বয়স নেই', বরং ব্যক্তির ইচ্ছাটাই প্রধান।

অসহায়ত্বের শিকার ও সিদ্ধান্তহীন একজন রাশেদা আখতারের জীবনের নিভু নিভু প্রদীপটাকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ ও 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ নতুনভাবে জ্বালিয়ে রাখার প্রেরণা দেয়। জীবনের যেখানে শেষ ভেবে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন রাশেদা আখতার, জীবনটা সেখান থেকেই আবার শুরু করার এক দৃঢ় প্রত্যয় তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে স্থির করে। এভাবেই রাশেদা আখতার পরিবারে, নিজ কর্মক্ষেত্রে, এবং সমাজে নারীর অগ্রগমন তথা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে একজন নিবেদিত কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার আশা– এভাবেই তার মত এগিয়ে আসবে আরও হাজার লক্ষ নারী, যাদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হবে মানবিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ সমাজ এবং প্রতিষ্ঠিত হবে নারীবান্ধব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান।

যখন ফিরে আসছিলাম, তখন ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের প্রতি শ্রদ্ধায় নিবেদিত দুটো লাইন আবৃত্তি করলেন রাশেদা আখতার–
"একটি আলোর কণা পেলে লক্ষ প্রদীপ জ্বলে
একটি মানুষ মানুষ হলে বিশ্ব জগত টলে।"

নিরলস মানবসেবায় রত আফরোজা কুসুম

স্বপন সিকদার

মহৎ কিছু করতে চাইলে বয়স কোনো বাধা হতে পারে না। বরং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে এবং নিজের কাজের গতিকে বাড়িয়ে নিতে হলে চাই পেশাদারি মনোভাব ও মেধা। এ দুটোর সমন্বয় ঘটিয়ে মাত্র ২৩ বছরেই ইউনিয়নে পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন কুমিল্লার মনোহরগঞ্জের আফরোজা কুসুম। সময়ের ব্যবধানে যিনি দুই দুই বার মনোহগঞ্জ উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৭৯ সালের ৫ জানুয়ারি। মনোহরগঞ্জ উপজেলার খিলা ইউনিয়নের সাতেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করে এক ফুটফুটে কন্যাশিশু। বাবা মোঃ আব্দুল বারী এবং মা আনোয়ারা বেগম-এর চার ছেলে ও দু মেয়ের মধ্যে আফরোজা কুসুম চতুর্থ। সাধারণ মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম নেয়া ছোট এ কন্যাশিশুটিই একদিন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হবে তা তখন কেউ-ই ভাবেনি। কিন্তু বর্তমানে এটিই বাস্তব সত্য।

১৯৮৯ সালে আফরোজার লেখাপড়া শুরু হয় সাতেশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে। এখান থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে তিনি ভর্তি হন পাশের গ্রামের পুজকরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৯৫ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করেন।

এসএসসি পাশের অল্পকিছু দিন পরই আফরোজা বাল্যবিবাহের শিকার হন। তার মতামত ছাড়াই পাশের গ্রামের একটি অশিক্ষিত ছেলের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। এটি মেনে নিতে পারেননি আফরোজা। তাই কিছুদিন পর বিয়ে ভেঙে দিয়ে তিনি আবার লেখাপড়া শুরু করেন। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হন লাকসাম নবাব ফয়জুন্নেছা কলেজে। কঠোর অধ্যাবসায়ের ফলস্বরূপ ১৯৯৭ সালে আফরোজা এইচএসসি পাশ করেন। এখানেই থেমে যাওয়া নয়। একই কলেজে বিএ-তে ভর্তি হন তিনি।

বিএ পড়াবস্থায় আফরোজা ১৯৯৮ সালে পাশের গ্রাম খিলার গোলাম মাওলার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পরেও লেখাপড়া চালিয়ে যান তিনি। কিন্তু ২০০০ সালে বিএ পরীক্ষায় অংশ নিলেও অকৃতকার্য হন।

যে নারীর একজন সাধারণ গৃহবধূ হিসেবেই ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা ছিল, সেই আফরোজা কুসুম তার আত্মশক্তি, যোগ্যতা ও বাবার কাছ থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা নিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারেননি। বরং জড়িয়ে পড়েন নানা সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে। ২০০১ সালে আফরোজা খিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি (স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি) সদস্য পদে প্রার্থী হয়ে বিজয়ী হন। ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন। ঐ বছর পার্শ্ববর্তী উত্তরদা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম রাব্বানী মজুমদার-এর আহ্বানে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১২৪তম ব্যাচে) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয় উত্তরদা ইউনিয়নের তাহেরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। চার দিনের প্রশিক্ষণ শেষে তার চিন্তার দ্বার খুলে যায়। ভাবতে থাকেন কীভাবে আরও বেশি পরিমাণে সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত হওয়া যায়। ২০০৩ সালে খিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনে অংশ নেয়ার সাহস সৃষ্টি হয় তার মধ্যে। ২৩ বছর বয়সের এই মেয়েটি খিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সবাইকে অবাক করে দেন।

শুর হয় আফরোজার নতুন পথচলা। আর থামতে হয়নি তাকে। ঐ বছরই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এসে যায়। খিলা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন তিনি। কিন্তু নির্বাচন করার জন্য দরকার

২৫ বছর বয়স। অথচ আফরোজার বয়স মাত্র ২৩ বছর। কুমিল্লা জজকোর্টের সাহায্যে বয়স বাড়িয়ে নির্বাচন করতে চাইলেন, কিন্তু তা-ও হলো না। তখন নিরুপায় হয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেন আফরোজা এবং সর্বাধিক ভোট পেয়ে খিলা ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য নির্বাচিত হন।

আফরোজা কুসুম জানান, এত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে নির্বাচন করার সাহস তিনি পেয়েছিলেন উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকেই। ইউপি সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরি হয়। তিনি নিজে বাল্যবিবাহের শিকার। তাই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারেন, বাল্যবিবাহের কী কুফল। তাই নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমেই আন্দোলন শুরু করেন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ইউপি সদস্য থাকাকালীন বাল্যবিবাহ বন্ধে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭২টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন, ফলশ্রুতিতে তিনি ২৮টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হন তিনি।

উজ্জীবক হওয়ার কারণেই সবসময় নতুন চিন্তা। নিজেকে আরও বিকশিত করার পরিকল্পনা। তাইতো ২০০৯ সালে মনোহরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হন আফরোজা। উদ্দেশ্য একটাই– মানুষের জন্য রাজনীতি করা, জনমানুষের সেবা করা। জনগণও তাকে নিরাশ করেনি। তিনি মোমবাতি প্রতীক নিয়ে ৪০,১৪০ (৫৭.৫৭%) ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

২০১০ সালে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নেন এই জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি। প্রশিক্ষণের প্রতিটি সেশনে ওঠে আসে তার নিজের জীবনের এবং চারপাশে বিরাজমান নারীর সত্যিকারের অবস্থা ও অবস্থান। পিতৃতন্ত্র ও নারীর ক্ষমতায়নের সেশনটি তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এ প্রশিক্ষণটি আফরোজার চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করে এবং সমাজের অবহেলিত নারীদের উন্নয়নে কাজ করার দৃঢ় সংকল্প নেন। শুরু করেন পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে উঠান বৈঠক। ২০ জন প্রতিবন্ধী নারীকে সরকারি ভাতার আওতাভুক্ত করেন তিনি। মনোহরগঞ্জ উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির এই কাজের মধ্য দিয়ে আফরোজা পুরো উপজেলায় সকলের মধ্যমনি হয়ে উঠেন। যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালে চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তিনি আবার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যন পদে নির্বাচিত হন।

পারিবারিক জীবনেও তিনি একজন সফল মানুষ। তার স্বামী ব্র্যাক-এর শিক্ষা কার্যক্রমে প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। আফরোজা-এর একমাত্র ছেলে বর্তমানে অষ্টম শ্রেণিতে (১৪ বছর বয়স) এবং একমাত্র মেয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে (১০ বছর বয়স) অধ্যয়য়নরত।

আফরোজা কুসুম এখন আর চার দেয়ালে আবদ্ধ একজন সাধারণ নারী নন, বরং একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তার বিচরণ এখন মনোহরগঞ্জ উপজেলার সর্বত্র। বয়সের বাধাকে জয় করে নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সমাজের উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন।

নারী জাগরণের একনিষ্ঠ কর্মী হাসিনা আক্তার

জিল্লুর রহমান

"একটা সময় ছিল আমরা মেয়েরা যখন এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতে চাইতাম, তখন অনেক বাধার সম্মুখীন হতাম। যদিওবা যাওয়ার অনুমতি মিলতো, সেক্ষেত্রে যেতো হতো পর্দা মেনে, বোরকা পরে। কিন্তু এখন সময় বদলে গেছে। সেসব বিধি-নিষেধের প্রাচীর ভেঙে আমরা নারীরা আজ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। নারীরা আজ মর্যাদার সাথে, সম্মানের সাথে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিতে শিখছে, দেশ গঠনে ভূমিকা রাখছে। অর্থাৎ পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে– এটা আজ প্রমাণিত সত্য।"

উপরের কথাগুলি বলছিলেন হাসিনা আক্তার, যিনি চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান। অন্য আর পাঁচজন সাধারণ বাঙালি নারীর মতই স্বামী-সংসার-ঘরকন্নার মধ্য দিয়ে গৃহবধূ হিসেবে তার বাকি জীবনটা পার করার কথা ছিল। কিন্তু সাংসারিক নানামুখী টানাপোড়েন, পারিবারিক ও সামাজিক বাধা-বিপত্তি এসব কিছুকে জয় করার তীব্র ইচ্ছাশক্তিই তাকে নিয়ে গেছে অন্য এক গন্তব্যে, সাফল্যের দ্বারে।

১৯৭৪ সালের জুন মাসে শাহরাস্তি উপজেলার রায়শ্রী ইউনিয়নের দলশিদ গ্রামের এক মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে হাসিনা আক্তারের জন্ম। পিতা মোঃ হাসান মিয়া একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং মাতা আফিয়া হাসান গৃহিণী। ছয় বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে হাসিনা আক্তার সবার বড়। তাদের পরিবারে অর্থের প্রাচুর্য না থাকলেও অভাব ছিল না। পারিবারিক প্রেরণায়ই তিনি পাঁচ বছর বয়স হতে বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করেন এবং দলশিদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪ সালে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করেন। লেখাপড়ার ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালে দলশিদ হাজী আকুব আলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং মেহের ডিগ্রী কলেজ থেকে ১৯৯২ সালে এইচএসসি পাশ করেন। এরপর পার্শ্ববর্তী উপজেলার কচুয়া বঙ্গবন্ধু ডিগ্রী কলেজ থেকে ১৯৯৪ সালে লাভ করেন বিএসএস ডিগ্রি। এর আগে ১৯৯২ সালে এইচএসসি পাশ করার পর একই এলাকার মোঃ শফিউল আজম চৌধুরীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন হাসিনা। তিনি ১৯৯৯ সালে প্রথম কন্যা সন্তান এবং ২০০৩ সালে দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের জননী হন।

হাসিনার শৈশব কেটেছে দুরন্তপনার মধ্য দিয়েই। কৈশোরে তার বয়সের অন্যরা যখন একটু চুপচাপ ও গৃহকোণে আবদ্ধ, তখন তিনি এসবের ধার ধারতেন না, এমনকি মায়ের শাসনও তাকে গৃহে বন্দি করে রাখতে পারেনি। ছোটবেলা হতেই হাসিনা আক্তার লক্ষ করতেন, নারীর প্রতি পরিবার-সমাজ তথা সব মহলের বৈষম্যমূলক চিন্তা-নীতি-আচরণ। তখনই তার অনুধাবন হয় যে, এসবের মূলে রয়েছে নারীর অশিক্ষা। তাই শিক্ষাই পারে সকল বৈষম্যের অবসান ঘটাতে। এমন অনুধাবন থেকেই তিনি নিজে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধাকেই বাধা মনে করেননি। লেখাপড়া চালিয়ে যাবার ব্যাপারে বিয়ের পূর্বেই হবু স্বামীর সাথে তার এক ধরনের সমঝোতা হয়, যার ফলশ্রুতিতে ঘরকন্নার সাথে যুক্ত থেকেও তিনি বিএসএস ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম হন।

১৯৯৭ সালে হাসিনা আক্তার পশ্চিম চিতষী ইউনিয়নের উঘরিয়া ইউ সি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ২০০৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন। ২০০৬ সালের জুলাই মাসে তিনি একটি স্থানীয় সংগঠন বিএসিই-তে যোগদান করেন। প্রায় তিন বছর এখানে চাকুরি করার পর ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে এ সংস্থায় কাজ করা থেকে অব্যাহতি চেয়ে নেন।

হাসিনা নারীদের অনগ্রসরতা, পশ্চাৎপদতা ও অসচেতনতা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্র খুঁজতে থাকেন। এরই মধ্যে ঘোষিত হয় তৃতীয় উপজেলা নির্বাচনের তফসিল। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত শাহরাস্তি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তিনি মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এলাকাবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন, বিশেষ করে নারী ভোটারদের রায়ে বিপুল ব্যবধানে তিনি জয়লাভ করেন।

শুরু হয় তার নতুন দায়িত্বের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে পথচলা। একদিকে বড় এলাকার প্রতিনিধিত্ব, বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রত্যাশা, অন্যদিকে কাজের অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে তিনি কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলেন। কীভাবে কাজ শুরু করবেন তা স্থির করতে কিছুটা সময় পার হয়ে যায়। এরই মধ্যে হাসিনা আক্তারের সাথে কথা হয় চৌদ্দগ্রাম উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রাশেদা আখতার-এর সাথে। রাশেদা আখতার তাকে নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণে (৫০তম ব্যাচ) অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। রাশেদা আখতার-এর আমন্ত্রণে ২০১০ সালে হাসিনা তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্রের প্রভাব এবং সমাজে নারীর অবস্থা এবং অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পান, যার মধ্যে এক নতুন বোধদয়ের সূচনা হয়। তিনি কাজ করার বিস্তর ক্ষেত্র খুঁজে পান।

প্রশিক্ষণ শেষে হাসিনা নিজ এলাকায় ফিরে এসে সামাজিক বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। জনপ্রতিনিধি হিসেবে শাহরাস্তি উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তিনি নিজে প্রতিটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এরফলে অল্প সময়ের মধ্যে হাসিনা প্রত্যক্ষভাবে দশটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হন। নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে তিনি আয়োজন করেন জেন্ডার বিষয়ক কর্মশালা। নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে তার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন এলাকায় গঠিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি। শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকার বিষয়ে সচেতন করতে হাসিনা আক্তার গ্রহণ করেন নানামুখী সমন্বিত উদ্যোগ। উপজেলা পরিষদের বাজেটে নারীর উন্নয়নে আর্থিক বরাদ্দের ব্যাপারে সব সময় সরব থেকেছেন। তার গৃহীত উদ্যোগের ফলে উপজেলায় নারী শিক্ষার অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে এবং বাল্যবিবাহের হার কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। আগের তুলনায় নারীদের চাকুরিতে যোগদানের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তার এসব কাজের কারণে তিনি এলাকায় পরিচিতি পেয়েছেন নারী জাগরণের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে।

২০১৪ সালে আসে চতুর্থ উপজেলা নির্বাচন। উন্নয়নমূলক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আবারও প্রার্থী হন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে। তিনি তো মানুষের জন্যই কাজ করেন। তাই এলাকার জনগণের ভালবাসায় বিপুল ভোটে এবারও তিনি জয়লাভ করেন। এ জয় হাসিনা আক্তারকে আরও সাহস যুগিয়েছে। এ সাহস ও জনগণের ভালবাসাকে পুঁজি করে তিনি চান তার উপজেলাকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে। একই সাথে চান নারীর জন্য বৈষম্যহীন একটি জনপদ। সে লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য অবিরত কাজ করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এ সংগ্রামী নারী।

নাছিমা জামান ববিঃ পুরুষতন্ত্রকে জয় করে আজ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান

রাজেশ দে

নাছিমা জামান ববি; রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। আত্মপ্রত্যয়ী, নিরাহঙ্কারী এক নারী। ২০০৯ সালে তিনি রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান, ২০১২ সালের পর থেকে একই পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (চেয়ারম্যান পদত্যাগ করায় তিনি এ দায়িত্ব পান) এবং ২০১৪ সালে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়ে সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। সাধারণত সামাজিক বাস্তবতার কারণে নারীরা সংরক্ষিত পদ ছাড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান না। কিন্তু এক্ষেত্রে নাছিমা জামান ববি ব্যতিক্রম। সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে তিনি এগিয়ে চলছেন তার লক্ষ্য অর্জনের পানে।

রংপুর শহরের বৈরাগী পাড়ায় বাবা প্রকৌশলী মোঃ নূরুজ্জামান আর মা রেহেনা জামানের ঘরে ১৯৭৪ সালের ২৫ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন ববি। তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে ববি সবার বড়। ছোট ভাই হারুন অর রসিদ বর্তমানে একটি এনজিও-তে কর্মরত আছেন। ছোট বোন ফারজানা জামান অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (মাস্টার্স) অর্জন করেন; তিনি বিবাহিত। ছোট বোন নাবিলা জামান ফ্যাশন ডিজাইনিং-এর ওপর লেখাপড়া করছেন।

প্রকৌশলী বাবার চাকুরির সুবাদে ববির ছোটবেলা কেটেছে রাজধানী ঢাকা, লালমনিরহাট ও রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায়। পীরগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় স্থানীয় শিশু সংগঠক মাসুদুর রহমান মিলু ও সুলতান আহম্মেদ সোনা-এর হাত ধরে শিশু সংগঠন 'খেলাঘর'-এর সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ববি বলেন, 'বাবা-মা ছিল আমার বন্ধুর মত। খেলাঘর-এর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে বাবা-মায়ের দিক থেকে কোন বাধা ছিল না, বরং তারা উৎসাহই দিতেন। পঞ্চম শ্রেণি পাশের পর ববি ভর্তি হন রংপুর পুলিশ লাইন্স স্কুলে। এখানে পড়াবস্থায় আন্তঃজেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কবিতা আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন তিনি। এরপর শিক্ষাজীবনের পুরো সময়ে ববি রংপুর বেতারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপনার কাজ করেন। ১৯৯০ সালে ববি এসএসসি পাশ করেন। এরপর তিনি রংপুরের বেগম রোকেয়া সরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে সেখান থেকেই পাশ করেন এইচএসসি। আবার একই প্রতিষ্ঠান থেকেই ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক (অনার্স) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (মাস্টার্স) অর্জন করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই ববি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রায়ই অংশগ্রহণ করতেন তিনি। ববি ১৯৯৪ সালে বেগম রোকেয়া কলেজে অধ্যয়নের সময়ে হলের খাবারের মান ও পরিবেশের উন্নতির জন্য সাধারণ ছাত্রীদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং কর্তৃপক্ষকে তাদের দাবি মানতে বাধ্য করেন। শিক্ষাজীবন এবং পরবর্তী কিছু সময় তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখিও করেছেন।

পারিবারিক স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও আত্মনির্ভরশীল হবার মানসিকতা থেকে স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'পরিবার উন্নয়ন সংস্থা'য় কর্মসূচি কর্মকর্তা (প্রোগ্রাম অফিসার) হিসেবে রংপুরের কাউনিয়া ও পীরগঞ্জে কিছুদিন কাজ করেন। এরপর সরকারের একটি শিক্ষা প্রকল্পে প্রায় দু বছর গাইবান্ধায় কর্মরত ছিলেন তিনি।

নাছিমা জামান ববি ১৯৯৯ সালে রংপুরের পীরগাছা উপজেলার তাম্বুলপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা সিরাজুল ইসলাম প্রামানিকের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তারা নিজেদের পছন্দে বিয়ে করার কারণে বাবার বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়ির কেউই তাদের এই বিয়ে মেনে নেয়নি। দু বছর পর বাবার বাড়ি থেকে মেনে নিলেও শ্বশুর বাড়ি থেকে তাদের বিয়ে মেনে নিয়েছে আরও কয়েক বছর পর। বর্তমানে তাদের একমাত্র কন্যা সন্তান সুমাইয়া সাইয়ারা দোয়া, বয়স তিন বছর চার মাস।

ববি ২০০০ সালে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার শঠিবাড়ী ইসলামিয়া আলিম মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত না হওয়ায় তিনি বিনা বেতনেই তিনি সেখানে শিক্ষকতা করতেন। এসময় তিনি রংপুরের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন। ববি সবসময়ই ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। তিনি নিজেকে নারী হিসেবে কখনও পিছিয়ে রাখতে চাইতেন না। ববি ২০০৩ সালে রংপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালে গ্রেফতার ও নির্যাতনের ভয় সত্ত্বেও তত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে যে আন্দোলন হয় তাতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৭ সালের প্রথমদিকে ববি গ্রেফতার ও নির্যাতন এড়াতে শঠিবাড়ী মাদরাসা থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে ময়মনসিংহের 'বন্ধু সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি নেন। সেখানে তিনি সাত মাস কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি আবারো রংপুরে ফিরে আসেন।

ববি ২০০৮ সালে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে (২৫তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণে নারী-পুরুষের ব্যবধানের কারণ যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ–সে বিষয়ে তার পূর্বের ধারণা আরও শক্তিশালী হয়। প্রশিক্ষণ থেকে তিনি উপলব্ধি করেন, একজন পুরুষ যা পারে তা একজন নারীর পক্ষেও করা সম্ভব। এই প্রশিক্ষণে পঞ্চগড়ের একজন অংশগ্রহণকারী ছিলেন নাহিদ আক্তার রত্না, যে নারী তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন দ্বারা ব্যাপকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এমনকি তার শরীরে অ্যাসিড নিক্ষেপ করেছিল তার দেবর। রত্নার নির্যাতনের কাহিনী ববিকে ভীষণ বিদ্রোহী করে তোলে। ববি নির্যাতিত নারীদের জন্য কিছু করার দৃঢ় সংকল্প নেন। প্রশিক্ষণে তিনি উপলব্ধি করেন যে, নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে তাদের অধিকার সচেতন হতে হবে, প্রতিবাদ করা শিখতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। ববির কথা বলা, ব্যবহার, সুন্দর বাচনভঙ্গি অন্য নারীনেত্রীদের কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তিনি নিয়মিত নারীনেত্রীদের ফলোআপ সভাগুলোতে আসতেন, নিজের অভিজ্ঞতা অন্যদের সাথে বিনিময় করতেন, অন্যদের কথাও মনোযোগের সাথে শুনতেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নাছিমা জামান ববি ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তার স্বামী তাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ প্রদান করেন। রংপুর সদর উপজেলায় তখন ১১টি ইউনিয়ন ছিল। নির্বাচনের আগে পুরো উপজেলার সব ইউনিয়নে যাওয়া হয়নি ববির, সকল জায়গায় তার পরিচিতিও ছিল না। এরসঙ্গে ছিল নির্বাচন করার আর্থিক সীমাবদ্ধতা। নির্বাচনী আইনের কারণে তাকে ছাড়তে হয় শিক্ষকতা। ছয় জন প্রার্থীর মধ্যে তার বক্তব্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং চাকুরি ছেড়ে নির্বাচনে আসা ইত্যাদি বিষয়গুলো ভোটারদের কাছে তাকে জনপ্রিয় করে তোলে। নির্বাচনে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৮ শ' এক ভোট পেয়ে বিজয়ী হন তিনি। অথচ তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভোট পান মাত্র সাতাশ হাজার।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর ববির কাজের পরিধি আরও বেড়ে যায়। তিনি উপজেলা পরিষদ পরিচালনার ম্যানুয়াল ভালোভাবে আত্মস্থ করেন। আইনে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে কজের সুযোগ কম থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে ক্ষমতায়িত করে সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন কাজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'উপজেলা উইমেন ডেভেলপমেন্ট ফোরাম'-এর সভাপতি হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের সহযোগিতায় বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বন্ধ, শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া রোধে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি আয়মুখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাড়াতে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে

স্থানীয় নারীদের সচেতন করে তোলেন। এছাড়া তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নত করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন।

২০১২ সালে রংপুর সদর উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নকে রংপুর সিটি করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঘোষিত হয় এ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের তফসিল। এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান পদত্যাগ করে সিটি করপোরেশনের মেয়দ পদে প্রার্থী হন। তখন প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে নাছিমা জামান ববি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান। এ সময় তিনি সকল কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। মমিনপুর ইউনিয়নে একটি ক্যানেলের কারণে দুটি গ্রামের মানষকে প্রায় এক কিলোমিটার বেশি হাটতে হত, শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়াও ছিল বেশ কষ্টের। তিনি স্থানীয় জনগণকে নিয়ে সভা করে তাদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, উপজেলা পরিষদের একার পক্ষে কাঠের পুলটি নির্মাণ করা সম্ভব নয়, তাই তাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। পরে জনগণের স্বেচ্ছাশ্রম ও পরিষদের আড়াই লাখ টাকা ব্যয়ে কাঠের পুলটি নির্মাণ করা হয়। নাছিমা জামান ববি পরিষদের উদ্যোগে চারটি ইউনিয়নে প্রায় দু কিলোমিটার পাকা সড়ক নির্মাণ করেন। স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সেবার মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখেন। তিনি প্রমাণ করেছেন নারী হয়েও দক্ষভাবে উপজেলা পরিষদের মত বড় পরিসরে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব।

২০১৪ সালে চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তিনি এবার রংপুর সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান নন, বরং চেয়ারম্যান পদে অংশগ্রহণ করেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সাধারণত এ পদে নারীদের মেনে নিতে চান না। কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান পদে থাকাকালীন তিনি প্রমাণ করেছেন দায়িত্ব পেলে নারীরাও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারে। শত বিরুদ্ধ প্রচারণা সত্ত্বেও নাছিমা জামান ববি জনগণের ভালোবাসায় চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন।

তিনি তার উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে পরিণত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। তিনি বেকারদের তালিকা তৈরি করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছেন। যেই দরিদ্র পরিবারের অন্তত ১০ শতক জমি আছে, তাদের উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পাঁচটি হাড়ি ভাংগা আম গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও রাস্তার ধারে হাড়ি ভাংগা আম গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত গৃহণ করা হয়। প্রতিটি পরিবার ২০টি গাছ দেখাশুনা করবে এবং আম বিক্রির টাকা ঐ পরিবারগুলোই পাবে।

ইতোমধ্যেই তিনি অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন সময় সরকারের সহযোগিতায় শ্রীলঙ্কা, জার্মানি, মালয়েশিয়া, অস্ট্রিয়া ও যুক্তরাজ্য সফর করেছেন। নারী শিক্ষার হার বাড়ানো, নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ববি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে সভা করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

নাছিমা জামান ববি মনে করেন, উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এবং এলাকার উন্নয়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করা গেলে মানুষ সরকারি সেবা পাবে, তারা স্বাবলম্বী হবে। সর্বোপরি কমবে দারিদ্র্য, গড়ে উঠবে সমৃদ্ধ উপজেলা।

বড় পরিসরে সমাজ উন্নয়নের প্রত্যাশা হাসমিন লুনার

পলাশ মন্ডল

হাসমিন লুনা– নারীনেত্রী ও দিনাজপুর সদর উপজেলার পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান। শৈশবের সেই চঞ্চলমতী ও অতি উৎসাহী সেই বালিকা আজ অনেক পরিনত। নিজেকে নিয়ে যেতে চান আরও বড় পরিসরে। উদ্দেশ্য মানুষের জন্য রাজনীতি করা, মানুষের সেবা করা।

হাসমিন লুনা ১৯৭৪ সালের ১ মে দিনাজপুর সদর উপজেলার কাউগা গ্রামের একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সরকারি হাসপাতালের হিসাবরক্ষক আর মা গৃহিণী। চার ভাই-বোনের মধ্যে বড় হওয়ায় পরিবারে তার গুরুত্ব ও দায়িত্ব একটু বেশিই ছিল। ছোটকাল থেকেই গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি লুনা মানুষের সাথে মিশতে এবং প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকতে পছন্দ করতেন।

১৯৮৯ সালে পাঁচবাড়ী দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন লুনা। এরপর ভর্তি হন দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজে। এইচএসসি পরীক্ষার আগেই পরিবারের মত ছাড়াই পার্শ্ববর্তী উমরপাই গ্রামের আবুল হোসেনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন লুনা। আট ভাই-বোন আর বাবা-মাকে নিয়ে স্বামীর সংসার। বিয়ে মানুষের জীবনে নিয়ে আসে একরাশ আনন্দ। কিন্তু তা না হয়ে ওঠেনি লুনার ক্ষেত্রে। কারণ বিয়ের পরই শ্বশুর বাড়ির লোকজন তার কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তাদের অমতে লুনার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। কলেজে যেতে না পারলেও অনেক চেষ্টার পর ১৯৯১ সালে এইচএসসি পরীক্ষার দেয়ার সুযোগ পান এবং পাশও করেন তিনি। এরপর পারিবারিক নানান জটিলতার কারণে লুনা আর লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। উপার্জনহীন স্বামীর ওপর শ্বশুর-শ্বাশুড়ির অভিমান লুনার জীবনে নিয়ে আসে এক কঠিন পরিস্থিতি। কোন উপায় না পেয়ে লুনাকে নেমে পড়তে হয় জীবন সংগ্রামে।

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। স্বল্প বেতনের চাকুরি করে আর জীবনের সাথে যুদ্ধ করে তিলতিল করে স্বাবলম্বী হতে থাকেন তিনি। মানুষের দুঃখ তাকে সর্বদাই কষ্ট দিত। সবসময়ই চেষ্টা করতেন মানুষের জন্য কিছু করার। এই প্রচেষ্টাই তাকে মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলে। উপকারী মানসিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে তিনি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন। এর মধ্যে লুনা তার বাবা-মায়ের অনুরোধে ফিরে আসেন বাবার বাড়িতে।

২০০৩ সালে স্বামী, পিতা ও এলাকার মানুষের অনুপ্রেরণায় শশরা ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে প্রার্থী হন তিনি। জনগণ তাকে নিরাশ করেনি, বরং তাদের ভালবাসায় নির্বাচিত হন লুনা। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি মনে করেছিলেন যে, এবার জীবনের একটা পরিবর্তন হবে। মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ বাড়বে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মহিলা সদস্য হিসেবে পরিষদে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখা ও মর্যাদা পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি নিজেও জানতেন যে, এটাই একজন মহিলা সদস্যের অবস্থান। এভাবে কাটতে থাকে ইউপি সদস্য লুনার জীবন।

২০০৪ সালে ইউনিয়ন পরিষদে আসা একটি চিঠি তার হাতে পড়ে। চিঠিতে ছিল দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে ইউপি প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আহ্বান। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে লুনা এবং শশরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মজিবর রহমানসহ সারাদেশ থেকে আগত প্রায় ৯০ জন ইউপি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। লুনার ভাষায়, এই প্রশিক্ষণে তিনি যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। তিনি বুঝতে পারেন– নারী হলেও তিনি মানুষ এবং পুরুষের পাশাপাশি তার দক্ষতা, যোগ্যতা ও অধিকারের কোন কমতি নেই। প্রশিক্ষণ শেষে একজন আত্মনির্ভরশীল, সাহসী ও উদ্যোমী মানুষের রূপে নিজেকে খুঁজে পান লুনা। তার উপলব্ধিতে আসে– স্থানীয় সরকারের

সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কীভাবে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবেই অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। শুরু হয় নতুনভাবে পথচলা।

লুনা স্থানীয় নারীদের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন। তার এলাকায় মৌখিকভাবে তালাকের প্রচলন ছিল। তিনি এর বিরোধিতা করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। যৌতুক ও বাল্যবিবাহের মত কুপ্রথা বন্ধ এবং পরিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে তিনি বলিষ্ঠ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। ফলে তিনি এলাকার মানুষের কাছে একজন সৎ, জনদরদী ও আদর্শ জনপ্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত হন। ২০০৬ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় ভারতের স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা নেয়ার জন্য কেরালা রাজ্য ভ্রমণ করেন। ভারত থেকে ফিরে সেখান থেকে সঞ্চিত নানান অভিজ্ঞতা নিজ ইউনিয়নে কাজে লাগানোর চেষ্টা শুরু করেন।

২০১০ সালের ৩০ জুলাই দিনাজপুর শহরের এনজিও ফোরাম-এ অনুষ্ঠিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন লুনা। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একদিকে তার নিজের জ্ঞানের পরিধি বাড়ে, অন্যদিকে সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষের ব্যবধানের কারণ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন তিনি। নারীর অগ্রগতি ছাড়া যে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়– তার মধ্যে এ ধারণা স্পষ্ট হয়। প্রশিক্ষণের পর তিনি নারী ইস্যুকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার ইউনিয়নের বাইরে পুরো উপজেলার নারীদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ শুরু করেন। ২০১১ সালের ২৭ অক্টোবর তিনি 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বিষয়ক ফাউন্ডেশন কোর্সের আয়োজনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এভাবে তিনি আরও অনেক নারীনেত্রী তৈরিতে সচেষ্ট থাকেন।

২০১১ সালে তিনি শশরা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পুনরায় তিনি মহিলা ইউপি সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে পুরো পরিষদের সব সদস্যদের নিয়ে বিশেষ উজ্জীবক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। লুনা দ্বিতীয়বার উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি ইউপি সদস্য হিসেবে সম্মান ও আত্মমর্যাদার সাথে কাজ করেন। পরিষদের যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তার মতামতকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করা হতো।

নারীনেত্রী লুনা আরও বড় কিছু করার চিন্তা করতে থাকেন। সুযোগ পেয়ে যান ২০১৪ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে। এক্ষেত্রে জনগণের উৎসাহ তাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে। এ নির্বাচনে দিনাজপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) পদে প্রার্থী হন তিনি। তার সামাজিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিই তাকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। ৭২,৭৭৭ ভোট পেয়ে তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৩৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

পূর্ব থেকেই অধিকার সচেতন লুনা তার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মদক্ষতার দ্বারা উপজেলা পরিষদেও নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। পূর্বের মত সামাজিক কাজের পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজেও তিনি জনগণের পাশে থাকেন আগের মত। প্রভাবশালী দখলদারের হাতে খাস জমি মুক্ত করে ভূমিহীনের মাঝে তা রিতরণে তাকে অনেক বাধার মুখে পড়তে হয়। কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ী লুনা কোথাও বাধাকেই বাধা মনে করেননি। কোন প্রলোভনই তাকে আদর্শহীন করতে পারেনি। কারণ, মানুষের জন্য কাজ করা তথা সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করাই লুনার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন।

নিজের জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হাসমিন লুনা বারবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রতি। বিশেষ করে এ সংস্থার কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার এর প্রতি। তিনি স্বীকার করেন– 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণ', 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ ও মজুমদার স্যারের প্রেরণায় তিনি নিজের ভেতর যে শক্তি খুঁজে পেয়েছেন সেটাকে কাজে লাগিয়েই আজ তিনি সফলতার দ্বারপ্রান্তে।

হাসমিন লুনা আরও এগিয়ে যেতে চান। আরও বড় পরিসরে সমাজের উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা তার। আগামীতে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তিনি চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। শুধু স্বপ্নই নয়, তিনি বিশ্বাসও করেন, আগামী নির্বাচনে দিনাজপুর সদর উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন এবং সমগ্র উপজেলা তথা দিনাজপুরের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কারিগর হতে পারবেন।

রশিদা বেগমঃ গৃহবধূ থেকে আজ জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি

রাজেশ দে

দারিদ্র্যের কষাঘাতে বেশিরভাগ মানুষই মুষড়ে পড়ে। কিন্ত আত্মপ্রত্যয়ী মানুষেরা দারিদ্র্যকে জয় করে সাফল্য ছিনিয়ে আনে; অন্যদের জন্য হয়ে ওঠে অনুপ্রেরণার উৎস। তবে এ দারিদ্র্যকে জয় করার জন্য চাই দৃঢ় প্রত্যয় আর নিরলস কর্মস্পৃহা। আর এ দুটোর সমন্বয় ঘটিয়েই নিজের জীবনে সাফল্য বয়ে এনেছেন মোছাঃ রশিদা বেগম। দরিদ্র পরিবারের এ নারী এক সময় ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত সদস্য, সময়ের পরিক্রমায় আজ তিনি গাইবান্ধা সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান।

১৯৮১ সালে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার খোলাহাটি ইউনিয়নের হাসেম বাজার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন রশিদা। বাবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আব্দুর রহিম, আর মা গৃহিণী মোছাঃ মিরজান বেওয়া। রশিদা বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। সাংসারিক অভাব-অনটনের কারণে বেশিদূর লেখাপড়া হয়নি তার। মাত্র দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পান তিনি। ১৯৭৮ সালে রশিদার বাবা মারা যান। এলাকার বখাটেদের উৎপাতের কারণে ১৯৮১ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সেই একই ইউনিয়নের বাসিন্দা মোঃ মোজাম্মেল হক মন্ডলের সাথে রশিদার বিয়ে হয়ে যায়।

বিয়ের সময় স্বামী ছিলেন বেকার। বাবার সংসারের মতই শ্বশুরবাড়িতে এসেও দারিদ্র্যের কষাঘাতে পিষ্ট হন রশিদা। কোনো রকম খেয়ে-পরে দিন কাটতে থাকে তার। কিন্তু তিনি মনে মনে ভাবতেন, নিশ্চয়ই একদিন তাদের পরিবারেও আসবে স্বচ্ছলতা। এই স্বচ্ছলতা শুধু তার নিজের জন্য নয়, বরং তার নেতৃত্বে পুরো এলাকার সবারই উন্নতি ঘটবে – এমন স্বপ্নও মনে মনেও পুষতেন তিনি। কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখলেই তো হবে না, স্বপ্নপূরণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে – এমন অনুধাবনও আসে রশিদার মধ্যে। এ সময় তিনি স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'একতা'র বয়স্ক শিৰা স্কুলে স্বল্প বেতনে চাকুরি নেন। এরপর ব্র্যাক-এর স্বাস্থ্য সেবিকা ও পরে আইন শিৰা সেবিকা পদে চাকুরি করেন।

অতি সাধারণ নারী হয়েও নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সমাজের সমস্যাগ্রস্ত মানুষদের সমস্যা নিরসনে তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। তার পেশাগত কাজের ধরনই ছিল মানুষের সাথে মিশে তাদের সচেতন করা। খোলাহাটি ইউনিয়ন ছাড়াও পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নসমূহে তিনি প্রায় ছয় হাজার জন নারীকে মুসলিম পারিবারিক আইন, হিন্দু পারিবারিক আইন ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইন-সহ বিভিন্ন আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করে তুলতে সক্ষম হন। স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি গর্ভবতী নারী ও শিশুদের পরিচর্চা ও চিকিৎসা এবং যক্ষা রোগের চিকিৎসা প্রদান করেন। এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বহুবিবাহ বন্ধ, বে-আইনি তালাক প্রতিরোধ, বিভিন্ন সালিশে অংশগ্রহণ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে অসামান্য অবদান রাখেন রশিদা। ব্র্যাক সামাজিক ৰমতায়ন কর্মসূচি কর্তৃক পলস্নী সমাজ গঠিত হলে তিনি এর সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। গ্রামে কোনো নারী নির্যাতনের শিকার হতে যাচ্ছেন– এমনটা শুনলে সাথে সাথে তিনি সেখানে ছুটে যেতেন এবং অসহায় ঐ নারীর পক্ষে দাঁড়াতেন। একই সময় তিনি মানবাধিকার কমিটি, স্কুল কমিটি ও নারী উন্নয়ন কমিটিসহ বিভিন্ন ৰমতা কাঠামোতে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের পরিচয় দেন।

এসব কাজ করতে গিয়ে তিনি এলাকার সুবিধা বঞ্চিত মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হন। স্থানীয় জনগণের আগ্রহে তিনি ২০০৩ সালে খোলাহাটি ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে প্রার্থী হন। জনগণের কাছের মানুষ তিনি। তাই তিনি কি পরাজিত হতে পারেন? না পারেন না। হয়েছেও তাই। বিপুল ভোটের ব্যবধানে রশিদা বিজয়ী হন। নির্বাচিত হবার পর তার কাজের পরিধি আরও বেড়ে যায়। বিভিন্ন কাজে তিনটি ওয়ার্ডের সব গ্রামেই তাকে যেতে হয়। নানান জনের সমস্যার কথা শুনতে হয় তাকে। রশিদা নিজের অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব তাদের সহায়তা করার চেষ্টা করতেন।

তিনি সমাজের মানুষকে সংগঠিত করে সামাজিক সমস্যা সমাধানে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সেবা যাতে জনগণ যথাযথভাবে পায় সে ব্যাপারে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

সমাজ উন্নয়নে আরও পরিসরে ভূমিকা পালনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০৯ সালে রশিদা গাইবান্ধা সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হন। কিন্তু অল্প ভোটের ব্যবধানে তিনি পরাজিত হন। কিন্তু তিনি তো দমে যাওয়ার মানুষ নন। কারণ মানুষের সেবা করার জন্যই তার রাজনীতি। তিরি পরবর্তী নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। একইসঙ্গে তিনি সামাজিক কাজ, বিশেষত অসহায় নারীদের অবস্থার পরিবর্তনে বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন।

২০১০ সালের ৫-৭ আগস্ট রশিদা বেগম রংপুরের তিলোত্তমা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বিষয়ক ফাউন্ডেশন কোর্সে (৫৭তম ব্যাচে) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে তিনি নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যের কারণ, জেন্ডার সমতা নিশ্চিতের গুরুত্ব, সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান এবং নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন। তিনি জানান, এ প্রশিক্ষণ সমাজকে নিয়ে তার চিন্তা করার শক্তি আরও বাড়িয়ে দেয়। সমাজে নারীদের অবস্থার পরিবর্তনে তিনি আরও পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে থাকেন। তিনি নিয়মিত আসতে থাকেন নারীনেত্রীদের মাসিক ফলোআপ সভায়। নতুন নতুন বিষয়ের সাথে পরিচিত হবার মাধ্যমে তিনি পিছিয়ে পড়া নারীদেরও সচেতন করার দায়িত্ব পালন করেন।

সময়ের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে আসে চতুর্থ উপজেলা পরিষদের নির্বাচন, যার জন্য রশিদার পাঁচ বছরের অপেক্ষা। তিনি পুনরায় মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এবার জনগণকে তাকে নিরাশ করেনি। ৫৭,৫৩৯ ভোট পেয়ে (নিকটতম প্রতিদন্দ্বীর থেকে প্রায় ২০ হাজার ভোট বেশি পেয়ে) তিনি নির্বাচিত হন।

রশিদা অনুধাবন করেন, নারীদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা হলো বাল্যবিবাহ। কারণ এটি কেড়ে নেয় কন্যাশিশুর শিক্ষা ও পুষ্টির অধিকার। এছাড়া মানসিক ও শারীরিক পরিপক্কতা না আসার কারণে বাল্যবিবাহের শিকার হওয়া মেয়েরা পারিবারিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয় এবং অল্প বয়সে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই এ কুপ্রথা বন্ধে পুরো উপজেলা জুড়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কমকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণে বিভিন্ন স্থানে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করেন, যার মাধ্যমে সচেতন করা সম্ভব হয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষকে।

ব্যক্তিগত জীবনে রশিদার দু ছেলে একাদশ শ্রেণিতে, এক মেয়ে দশম শ্রেণিতে এবং ছোট মেয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। তিনি তার সন্তানদের মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান। একইসঙ্গে ভূমিকা রাখতে চান আশেপাশের মানুষগুলো তথা তার পুরো উপজেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে। সে লক্ষ্য অর্জনেই সচেষ্ট রয়েছেন তিনি। তার বিশ্বাস, তিনি তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন, যেমনিভাবে পেরেছেন একজন গরীর ঘরের সাধারণ গৃহবধূ থেকে উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হতে।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অ্যাডভোকেট নিশাতের গল্প

তুহিন আলম

অ্যাডভোকেট তাসলিমা সুলতানা খানম নিশাত, তাকে নিয়ে সফলতার গল্প করা যাবে অনেক। শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা এবং সর্বোপরি সমাজসেবায় তার নানামুখী অবদানের গল্প। তবে ভালোলাগার ব্যাপারটি ঘটে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ উপজেলা নির্বাচনে। মানুষের ভালোবাসায় অভিভূত হন তিনি। সে সময় 'কলস'-এর রব উঠে মানুষের মুখে মুখে। অ্যাডভোকেট তাসলিমা সুলতানা খানম নিশাত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচন হতে যাচ্ছেন– এমন কথা নিশ্চিত করেই বলছিলেন সবাই। হয়েছেও তাই। সর্বোচ্চ ৭৫ হাজার ৫৫২টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন নিশাত। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে প্রায় ১৬ হাজার বেশি ভোট পান তিনি। আর বিজয়ী চেয়ারম্যান এবং সাধারণ আসনের ভাইস চেয়ারম্যানের চেয়ে তার ভোটের ব্যবধান ১৭ হাজারেরও বেশি। সর্বোচ্চ ভোটে তার বিজয় পুরো উপজেলা জুড়েই আলোচনায় এনে দেয় তাকে।

প্রসঙ্গত, এর আগে নিশাত দলের তৃণমূলের সভায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হন। যোগ্যতার বিচারে দলমত নির্বিশেষে সব শ্রেণির ভোটারদের পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিয়েছিলেন নিশাত। তার জন্যে ভোট চাইতে মাঠে নামেন আইনজীবী ও সাংবাদিকসহ সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। এ রকম একটি অবস্থায় অ্যাডভোকেট নিশাত জয়ের ব্যাপারে প্রচণ্ড আশাবাদী হয়ে উঠেন প্রথম থেকেই। তারপর নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়। সুতরাং তার প্রতি ভোটারদের আবেগ ও ভালবাসার প্রমাণ দিতে হবে তাকে– এটা অনুধাবন করেন নিশাত। এমন অনুধাবন থেকে মানুষের জন্যে সর্বোচ্চ কাজ করার আগ্রহ তৈরি হয় তার মধ্যে। দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই সেদিকে মনোযোগীও হন তিনি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা পরিষদের দোতলায় অবস্থিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের কক্ষটি সব সময় মুখরিত থাকে। মুখরিত থাকে সমাজের অসহায়-দরিদ্র নারী, তৃণমূলের নারী প্রতিনিধিদের পদচারণায়, যা আগে দেখা যায়নি। সবকিছুতে তাদের ভরসাস্থল উপজেলা পরিষদের এই নারী প্রতিনিধি। অ্যাডভোকেট নিশাতও বসে নেই। নারীদের আত্মনির্ভরশীল করার কাজকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার আট মাসের মধ্যে তিনি ধাত্রী ও হস্তশিল্প বিষয়ে ছয়টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। এতে ২১০ জন নারী স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পায়।

অ্যাডভোকেট নিশাত অনেক পরিচয়ে পরিচিত। রাজনীতিক ছাড়াও একজন আইনজীবী, সাংবাদিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে পরিচিতি রয়েছে তার। প্রতিবন্ধীদের সেবায় দীর্ঘসময় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এই নারীনেত্রী। 'সুইড-বাংলাদেশ' নামক একটি সংস্থা পরিচালিত 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসমাতুন্নেছা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল'-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৫ বছর প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এরপর যুক্ত হন আইন পেশায়। এ পেশায়

সফলও হন তিনি। ২০১২ সালের এপ্রিলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা জজ আদালতের এপিপি (সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর) নিযুক্ত হন অ্যাডভোকেট নিশাত।

তার রাজনীতিতে পদচারণা হয় ১৯৮৯ সালে– বাংলাদেশ ছাত্রলীগে যোগদানের মাধ্যমে। অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি তার যোগ্যতাবলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের মহিলা সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে জেলা ছাত্রলীগের মহিলা সম্পাদিকা পদে নির্বাচিত হয়ে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। দলের প্রতি নিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধের কারণে তিনি জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। দীর্ঘ এই সময়ে নানা আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন অ্যাডভোকেট নিশাত। একারণে একাধিক মামলাও হয় তার বিরুদ্ধে।

রাজনীতির পাশাপাশি অ্যাডভোকেট নিশাত বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত। তিনি সুইড-বাংলাদেশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডায়াবেটিক হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনিটের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, তিতাস সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ-এর উপদেষ্টা এবং বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সভানেত্রী, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর-এর জাতীয় পরিষদ সদস্য। এছাড়া তিনি সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে, যেমন, জেলা স্বাস্থ্য কমিটি ও জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সদস্য এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের একজন বেসরকারি পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক ও নারীনেত্রী হিসেবে অ্যাডভোকেট নিশাত দরিদ্র নারী সমাজের কল্যাণে ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নারীদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে সহায়তা করেন। ক্রীড়াঙ্গনে তথা নারীদের ক্রীড়া উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তার। জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক সম্পাদিকা হিসেবে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এসময় ক্রীড়া দলের টিম লিডার হিসেবে বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন দলের জন্য ব্যাপক সফলতা বয়ে আনতে সক্ষম হন।

সাংবাদিকতার জগতেও রয়েছে তার বিচরণ। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পাঠক নন্দিত সাপ্তাহিক 'গতিপথ'র নির্বাহী সম্পাদক। নিশাত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত অ্যাডভোকেট লুৎফুল হাই সাচ্চুর স্মারকগ্রন্থ 'নক্ষত্র' সম্পাদনা করেন। ২০০৭ সালে তিনি নারী সাংবাদিকতায় 'সালমা সোবহান ফেলোশিপ' (ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া) অর্জন করেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর উজ্জীবক হিসেবে ২০০৩ সালে ভারত এবং ২০০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, পার্থ, সিডনি ও সিঙ্গাপুর সফর করেন অ্যাডভোকেট নিশাত। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে ২০১৪ সালের নভেম্বরে তিনি থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও অস্ট্রেলিয়া সফর করেন।

নিশাতের জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের পুনিয়াউটের সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে। তার পিতার নাম মোমিনুল হক কিরন। তিনি একটি জুট মিলের রফতানি বিভাগের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। মাতার নাম হোসনে আরা খানম। ছয় বোনের মধ্যে নিশাত তৃতীয়। চাকুরি থেকে পিতার অবসরের পর পরিবারের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিতে হয় নিশাতকে। পরিবারের

একজন ছেলে সন্তানের অভাব পূরণ করেন তিনি। অ্যাডভোকেট নিশাত বিবাহিত। তার স্বামী জাবেদ রহিম বিজন দৈনিক মানবজমিনের নিজস্ব প্রতিবেদক (স্টাফ রিপোর্টার)। নিশাত এক সন্তানের জননী। কন্যা ফাবলীহা রহিম উৎসার বয়স ১৫ মাস।

নিশাতের দাদা আবদুর রহমান খান পাকিস্তান আমলে পাটমন্ত্রী ছিলেন। সে হিসেবে তাদের বাড়িটি এখনো পুনিয়াউট মন্ত্রী বাড়ি হিসেবেই পরিচিত হয়। তার শ্বশুর প্রয়াত আবদুর রহিম হুমায়ুন ছিলেন একজন জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিক। তিনি ১৯৬৩ থেকে ৭৩ সাল পর্যন্ত সাদেকপুর পশ্চিম ইউনিয়ন – (বর্তমানে বড়াইল ইউনিয়ন) এর চেয়ারম্যান ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকায় দৈনিক 'কিষাণ' ও দৈনিক 'বাংলার মুখ'-এ সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কর্মরত ছিলেন বৃহত্তর কুমিল্লার পাঠকনন্দিত দৈনিক 'রূপসী বাংলায়'। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী আবদুর রহিম হুমায়ুন ভৈরবের রানীর বাজারে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার অপরাধে তার দোকান ঘরটি আগুন দিয়ে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয়া হয়। নিশাতের শ্বাশুড়ি তুহুরা বেগম একজন সমাজকর্মী। 'নবজাগরণী সংস্থা' নামে তার নিজের একটি বেসরকারি সংস্থা রয়েছে। নিশাতের দাদা শ্বশুর প্রয়াত আবদুর রউফ ছিলেন ইস্ট পাকিস্তান এডুকেশন সার্ভিসের পরিচালক। তার চাচা শ্বশুর আবদুর রহমান তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক। মামা শ্বশুরদের মধ্যে বর্তমানে জীবিত জহিরুল করিম কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছিলেন।

অ্যাডভোকেট নিশাত-এর শ্বশুর বাড়ি নবীনগর উপজেলার বড়াইল ইউনিয়নের জালশুকা মোল্লা বাড়িও ঐ অঞ্চলের এক আলোকিত বাড়ি। ব্রিটিশ আমল থেকেই নামডাক ছিলো এ বাড়ির। এ বাড়ির বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

অ্যাডভোকেট তাসলিমা সুলতানা খানম নিশাত একজন আইনজীবী হয়ে ভবিষ্যতেও গরীব মানুষদের আইনি সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতে চান। তিনি মনে করেন, 'একজন নারীর জীবনে এক একটা সফলতা যে কতটা আনন্দদায়ক, যে নারী সফল হয়নি সে কোনদিন অনুভব করতে পারবে না।' তাই মানুষকে ভালবেসে এবং কাজের প্রতি সম্মান রেখে তিনি এগিয়ে যেতে চান অনেক দূর। এটাই তার একমাত্র অঙ্গীকার।

নিবিড় জনসংযোগের মাধ্যমে সাফল্যের শিখায় মরিয়ম বেগম শেফা

আসির উদ্দীন

মরিয়ম বেগম শেফা। কঠোর পরিশ্রমী, সার্থক এক নারীর উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। মাত্র ১৩ বছর বয়সে যিনি শুরু করেছিলেন তার রাজনৈতিক জীবন– তিনিই আজ নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান। এ উপজেলার অনেক অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতাকে টেক্কা দিয়ে খুব অল্প সময়ে এই নারী কী করে উঠে এসেছেন এই সাফল্যের স্বর্ণালী শিখরে? তার পেছনে কোন শক্তি কাজ করেছে? হ্যাঁ করেছে। তাহলে কী সেই শক্তি? অপরাজিতা এই নারী কীভাবে সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে তার নিজের দিনবদল করেছেন সে কাহিনীই লিখতে চলেছি।

মরিয়ম বেগম শেফা ১৯৭৬ সালে পত্নীতলা উপজেলার শিহাড়া ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমানে ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই সৃজনশীল কাজে বেশ ঝোঁক ছিল তার। সহপাঠীদের সাথে খেলা করা, কিংবা গাছে উঠে ফল পেড়ে একত্রে বসে খাওয়া ছিল বেশ মজার। গ্রামের নির্মল আলো-বাতাসে বেড়ে উঠতে থাকেন, আর শুরু করেন পাঠ গ্রহণ। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে আমন্ত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সালে এসএসসি এবং পরবর্তীতে কৃষ্ণপুর কলেজ থেকে ২০০৩ সালে এইচএসসি পাশ করেন তিনি। বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিতে ক্যাপ্টেন হিসেবে মরিয়ম সকলের দেখভাল করতেন, সহপাঠীরাও তাকে ভালবাসতো। এর মধ্য দিয়েই তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ হতে থাকে। কলেজে অধ্যয়নকালীন যখন কোন গরিব কিংবা সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে দেখতেন, তখনই সাধ্যমত ছুটে যেতেন তাকে সহায়তা করতে। এজন্য বার বার বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিতে হয়েছে এবং সহ্য করতে হয়েছে বকুনিও।

কিশোর বয়সের দুরন্তপনার সময়ে ১৯৯৮ সালে বাবা-মায়ের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় মরিয়মকে। স্বামী আনিছুর রহমান পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদ ও সফল সংগঠক। বিয়ের পর মরিয়ম স্বামীর সাথে নজিপুরে চলে আসেন। শুরু হয় সংসার তার সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পালা। সংসারের কাজে মনোনিবেশ করে মরিয়ম নিজেদের জীবনটাকে গুছিয়ে নেন খুব সুন্দর করে। জীবনের আনন্দময় মুহূর্তে একমাত্র সন্তানের আগমন পরিবারে এনে দেয় পূর্ণতা।

২০০১ সালের দিকে স্বামীর হাত ধরেই রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ ঘটে মরিয়ম-এর। সেই থেকে শুরু, আর পেছনে ফিরে তাকাবার সময় হয়নি। ২০০৩ সালে শিহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী সদস্য হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধি হওয়ার আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সেবার অল্প ভোটের ব্যবধানে জনপ্রতিনিধির খেতাব না পেলেও দমে যাননি তিনি, বরং রাজনীতির মাঠেই থেকেছেন পুরো সময়। স্বামীর সাথে ঘুরে বেড়িয়েছেন উপজেলার সকল গ্রামে। এর মধ্য দিয়ে জনমানুষের মুখে ছড়িয়ে পড়ে মরিয়ম-এর নাম। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ধারণ করে স্থানীয় উন্নয়নে অংশীদার হতে জনসংযোগ শুরু করেন তিনি। কর্ম-প্রচেষ্টায় সকলের মন জয় করে উপজেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের শীর্ষ পদ তথা সভাপতি নির্বাচিত হন মরিয়ম বেগম।

মরিয়ম বেগম ২০০৮ সালের নভেম্বরে জয়পুরহাটের টিএমএসএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন এবং পুরুষতন্ত্রের প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ধারণা পান। তার মধ্যে এই অনুধাবন তৈরি হয় যে, নারীদের অধঃস্তনতার জন্য নিজেদের

কর্তব্যহীনতাই প্রধানত দায়ী। তিনি নিজেকে বিকশিত করে জনকল্যাণের লক্ষ্যে আরও বড় পরিসরে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর পাশাপাশি প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া মর্মবাণী উপজেলার অন্তত ২০ শতাংশ নারীকে জানাবেন। অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠে ফিরে আসেন নিজের কর্ম এলাকায়। নারীদের দাবিগুলো নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেন তিনি। উপজেলার প্রতিটি কমিটিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বিরামহীন গতিতে এগিয়ে চলেন তিনি। নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক বা নারীর প্রতি বঞ্চণার ঘটনাগুলো শক্ত হাতে দমন করে নারীবান্ধব জনপ্রতিনিধি হিসেবে মরিয়ম খ্যাতি অর্জন করেন।

রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ তখনও খুব বেশি ঘটেনি। তিনি তখন প্রতিটি ইউনিয়নে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্রত নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন। এরই মধ্যে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। তখন দলের পক্ষ থেকে সবাই উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হিসেবে মরিয়ম বেগমের নাম সমর্থন করেন। দলীয় সমর্থন নিয়ে নেমে পড়েন নির্বাচনী প্রচারণায়। নির্বাচনে চার জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে একমাত্র তিনিই ১১টি ইউনিয়ন এবং নজিপুর পৌর এলাকা থেকে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে বহুদিনের লালিত জনপ্রতিনিধি হবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় মরিয়ম বেগম-এর। এখন শুধুই সামনে এগিয়ে যেতে হবে, তাই শুরু হয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং গণমানুষের সাথে থেকে টেকসই উন্নয়নকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে তার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো তিনি নিজ হাতে করে সাফল্যের শুভ সূচনা করেন।

সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য মরিয়ম নিজের বাসায় গড়ে তোলেন কুটির শিল্পের কাজ। ১০ জন নারীকে কারচুপির কাজে (কাপড়ের ওপর পুঁথি ও পাথর বসিয়ে বাহারি ডিজাইনের একটি পদ্ধতি হলো কারচুপি) লাগিয়ে নতুন দিগন্তের সূচনা করেন তিনি। সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে পত্নীতলা উপজেলায় ১৩৪টি সংগঠন গড়ে তোলা এবং নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন মরিয়ম। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দলমত নির্বিশেষে প্রকৃত উপকারভোগীর নিকট সহায়তা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে আপোষহীন ভূমিকা পালন করেন তিনি। উপজেলা মহিলা উন্নয়ন ফোরাম, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, মহিলা আইন সহায়তা-সহ বেশকিছু সংস্থার কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। এসমস্ত সংগঠনের মাধ্যমে উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে নারীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন তিনি। বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে উপজেলার ২,১৯৫ জন গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মাকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা পৌঁছে দেয়া সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ দাইমা প্রশিক্ষণসহ প্রায় দু হাজার নারীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেন মরিয়ম বেগম।

কর্মব্যস্ত জীবনে কখন যে পাঁচ বছর কেটে যায় তা টের পাননি মরিয়ম। ২০১৪ সালে আসে চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। পূর্বের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় একরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই পুনরায় নির্বাচিত হন তিনি। জনগণের আস্থা তাকে সামনে এগিয়ে যওয়ার নব উদ্যম এনে দেয়। পূর্বের ন্যায় এবারও তিনি প্রতিটি গ্রামের উন্নয়নে নারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জনপ্রতিনিধি হিসেবে একজন সফল নারী মরিয়ম বেগম জানান, যে কোনো কাজে সাফল্য অর্জনের মূলমন্ত্র হচ্ছে– কর্মনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা এবং কঠোর পরিশ্রম। প্রতিদিন আমাকে মানুষের কাজে অনেক ব্যস্ত থাকতে হয়। আমি আমার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড প্রতিদিনই আগে থেকেই নোট (লিখে রাখা) করে রাখি। যাতে পরের দিনটিতে জন-সংযোগ স্থাপনে আমাকে বিপাকে না পড়তে হয়।" তিনি আরও বলেন, 'আমার সাফল্যের পেছনে 'হাসিমুখে থাকা' একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমি সব সময় মুখে হাসি ধরে রাখি। যাতে আমার জনগণ আমাকে তাদের সেবক মনে করে এবং নির্বিঘ্নে যে কোনো সহায়তা চাইতে পারে।'

মরিয়ম বেগম বলেন, 'একথা আমরা সবাই জানি যে, নারীদের ধৈর্য বেশি। সেদিক থেকে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য পুরুষদের চাইতে তারাই অধিকতর যোগ্য। আমার পরামর্শ হচ্ছে, নারীরা যেনো তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই যোগ্যতার সঠিক প্রতিফলন ঘটান।' তিনি আরও বলেন, 'আমার সাথে অতীতে অনেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। তাদের অনেকেই নিজেদের আত্মবিশ্বাস আর পরিশ্রম দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি নিজেও তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হই।'

মরিয়ম বেগম শেফা বিশ্বাস করেন, 'নারীর ক্ষমতায় ও নারী-পুরুষ সমতা মানেই জাতির সমৃদ্ধি। তাই নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' এ বিশ্বাসকে ধারণ করেই নারী জাগরণের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছেন তিনি।

মানসিকতার উন্নয়নই সত্যিকার উন্নয়নঃ বিশ্বাস মর্জিনা আক্তারের

আসির উদ্দীন

বরেন্দ্র অঞ্চলের নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ মর্জিনা আক্তার। শুধু নামে নয়, কর্মগুণেও অসাধারণ একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে রূপান্তর ঘটেছে তার। বাবা মৃত গিয়াস উদ্দিন মন্ডল এবং মা মামুদা বেগম-এর দু সন্তানের মধ্যে বড় তিনি। ছোটবেলা থেকেই মানুষের সাথে মিশে তাদের নেতা হিসেবে আজ স্থান করে নিয়েছেন মর্জিনা আক্তার।

শিশুকালে দাউল বারবাকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বনভোজনের উদ্দেশ্যে রাজশাহী চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভাষা নিয়ে কৌতুহলের কারণে সেখানকার মধুরস্মৃতি এখনও মাঝে মাঝে দোলা দেয়। শৈশবকালের দুরন্তপনা এখনও স্বভাবসুলভভাবেই মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়। বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে একসাথে খেলা করা আর বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতি মন থেকে ভুলবার নয়। সে সময়ের সেই স্মৃতিগুলো কালের বিবর্তনে যেন ম্লান হয়ে না যায় তাইতো ঘুরে বেড়ানো এখনও রীতিতে পরিণত হয়েছে মর্জিনা আক্তার-এর।

দুরন্ত কিশোরী মর্জিনা আক্তার ছোটবেলা থেকেই মানুষকে নিয়ে ভাবতে থাকেন, মানুষের জীবন-যাপন ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি প্রায়ই বন্ধুদের সাথে আড্ডার ছলে খোলামেলা কথা বলতেন। স্কুলজীবনে দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া কখনও মেনে নিতে পারতেন না। সহপাঠীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দরিদ্র মেয়েদের খাতা, কলম কিংবা স্কুল ড্রেস কিনে দিতেন। মর্জিনা আক্তারের নেতৃত্বের প্রশংসায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী এবং এলাকার সুধীজনরা প্রায়ই তার বাবাকে বলতেন– তোমার মেয়ে একদিন বড় মানুষ হবে। তাদের কথা শুনে বাবাও মেয়েকে উৎসাহ দিতেন।

২০০৩ সালে দাউল বারবাকপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করার পর মর্জিনা ভর্তি হন জাহাঙ্গীরপুর সরকারি কলেজে। লেখাপড়ায় তিনি বরাবরই মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু বিধাতার কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় মর্জিনার পরিবারকে। ২০০৩ সালে অকালেই বাবার মৃত স্তব্ধ করে দেয় তাদের। ফলে সংসারে নেমে আসে অভাবের ঘনঘটা। তাইতো বাধ্য হয়েই ছোট ভাইকে ২০০৭ সালে কর্মের সন্ধানে পাঠিয়ে দেয়া হয় সিঙ্গাপুরে। মাকে নিয়ে সংসারের হাল ধরেন মর্জিনা। পড়ালেখা আর হয়ে উঠলো না তার।

সব সময় বাবার অনুপ্রেরণা এবং উদ্দীপনা মনের ভেতর আন্দোলিত করে, ভাবতে থাকেন কিছু একটা করতে হবে। এরই মধ্যে এটিএন বাংলা কর্তৃক নির্বাচিত সাদা মনের মানুষ শামসুদ্দিন মন্ডল-এর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১৩৭৪তম ব্যাচে)। প্রথমে মর্জিনা আক্তার ভাবেন, কী হবে এই প্রশিক্ষণ নিয়ে? কিন্তু প্রশিক্ষণে আত্মশক্তি বৃদ্ধির আলোচনা এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নারীর পশ্চাৎপদতাই দায়ী– এমন আলোচনা তাকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি যেন নতুন পথের দিশা পান। শুরু হয় নিজেকে এবং সমাজকে পাল্টাবার পালা। এলাকায় নারীদের সংগঠিত করে বাড়িতে বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে এলাকার প্রতিটি পাড়ায় কর্মশালা পরিচালনা করেন তিনি।

এলাকার নারীদের সাথে এভাবে মেশার সুযোগ এর আগে কখনও হয়নি মর্জিনার। তাই নারীদের বিপদে-আপদে ছুটে যান সুযোগ পেলেই। এলাকার নারীরাও মনের কথা বলার জন্য একটি নিরাপদ স্থান খুঁজে পান।

এলাকায় মানুষের মাথে মিশে কাজ করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন, অর্থ আসলে মানুষের উন্নয়নের একমাত্র উপলক্ষ নয়। জীবনের জন্য অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি এবং মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সমাজে ঘটে না বলেই মানুষে মানুষে হানাহানি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এলাকায় নারীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছেন, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নারীদের ব্যবহার করে পুরুষের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে। এ অবস্থা থেকে নারীদের মুক্তি দিতে না পারলে সমাজ বেশিদূর এগুবে না।

চিন্তার জগতে নানান বিষয়ে দোলা – ঠিক এ সময় মর্জিনা আক্তারের সাথে পরিচয় ঘটে মহাদেবপুরের একদল নারীনেত্রীর সাথে। তিনি নারীনেত্রী শাহনাজ বেগমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২০০৯ সালে রাজশাহীতে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণে (৩২তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে নারীর অগ্রযাত্রায় পুরুষতন্ত্রের প্রভাব অনুধাবনসহ অনেক প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পান মর্জিনা। পুরুষতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব–তা নিয়ে অন্যান্য নেত্রীদের সাথে আলোচনা করেন। পরিকল্পনা করেন প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে গিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীদের সোচ্চার করে তুলবেন। এলাকায় ফিরে পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে মানুষের সাথে মিশতে থাকেন। অনেকে মর্জিনাকে অপরিণত বয়সে পাকনা মেয়ে বলে ভর্ৎসনা করতে থাকে। কিন্তু যার পরিধি অনেক উপরে তিনি কি এসবের ধার ধারেন? নেতৃত্বের পরীক্ষায় এবার নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাবেক ডেপুটি স্পিকার আখতার হামিদ সিদ্দিকীর পক্ষে এলাকায় জনসংযোগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ফলে মহাদেবপুর উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন এবং গ্রামে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কর্মীদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন তিনি। এভাবেই রাজনীতির বড় অঙ্গনে আবির্ভাব ঘটে মর্জিনা আক্তারের। মর্জিনার নেতৃত্ব এবং সাহসিকতার জন্য তাকে মহাদেবপুর উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। বেশ বড় দায়িত্ব নিয়ে নতুন উদ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাবার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যান তিনি। ২০১৪ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলে বিএনপি'র সমর্থনে তিনি মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হন। এর আগে অনুষ্ঠিত দলের সভায় সকলে মর্জিনা আক্তারকে উক্ত পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য সমর্থন দেয়া হয়। নির্বাচনে জয় পেতে সারাদিন তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় সময় কাটান। জয় করেন মানুষের মন, যার ফলশ্রুতিতে বিপুল ভোট পেয়ে এক রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই জয়লাভ করেন মর্জিনা আক্তার।

মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রকৃত নেতা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে নেন তিনি। সামজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রকল্পসমূহের দেখভাল করার জন্য তিনি উপজেলা মহিলা বিষয়ক, সমাজ সেবা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-সহ বেশ কয়েকটি দপ্তরে জনসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনদুর্ভোগ যাতে পোহাতে না হয় সেজন্য নিজে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। এলাকার মেধাবী ও দরিদ্র মেয়েদের লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করছেন তিনি। প্রতিটি ইউনিয়নে দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং ব্যবসায়ী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ব্যাংকঋণের ব্যবস্থা করছেন। মহাদেবপুর উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে উপজেলা পরিষদ হতে নির্ধারিত বাজেটের মধ্য থেকে রাস্তাঘাট উন্নয়নে কাজ করেছেন তিনি। মসজিদ, মন্দির, ঈদগাহ, শ্মশান, খেলার মাঠ ও ক্লাব সংস্কারের জন্য সংসদ সদস্য এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সাথে একযোগে কাজ করছেন মর্জিনা আক্তার।

প্রতিটি শিশু যাতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় সেজন্য একাধিকবার ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সভা করেছেন মর্জিনা। শিক্ষকমণ্ডলী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে সভার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধে উপবৃত্তি প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন তিনি। নারীদের যথাযথ ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম-এর মাধ্যমে অধিকার সচেতন করে তোলা এবং সামাজিক উন্নয়নে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে চলেছেন। এলাকায় শিশুবিবাহ, যৌতুক এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে কাজ করছেন এবং প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে চলেছেন। প্রতিটি মা যেন স্বাস্থ্যসেবা সঠিকভাবে পায় সেজন্য উপজেলা হাসপাতাল এবং পরিবার

পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নারীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছেন মর্জিনা। এছাড়াও মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনে নিবেদিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন তিনি।

মর্জিনা আক্তার তার কার্যক্রম পরিচালনায় সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি সবসময় মাথায় রেখে এগিয়ে চলেছেন। ভাইস চেয়ারম্যানের নয়, কার্যক্রমগুলো উপজেলা পরিষদের– এমন ভাবনা তার। তাই পরিষদের চেয়ারম্যানসহ তিন জনের মতামতের চমৎকার মিলের কারণে জনগণের আস্থার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পরিষদের নিজেদের এলাকা আছে, জনগোষ্ঠী আছে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় অর্থনৈতিক সক্ষমতা না থাকা এবং অনির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাধান্যের কারণে নিজেদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে, এটা সত্যি বেশ দুঃখজনক মনে করেন মর্জিনা বেগম। তিনি মনে করেন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সহায়তা সরাসরি উপজেলা পরিষদে হস্তান্তর করতে হবে।

এলাকার মানুষের নির্বাচিত নেতা হিসেবে মানুষকে সাথে নিয়ে এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন মর্জিনা আক্তার। তিনি মনে করেন, মানুষের মানসিকতার উন্নয়নই সত্যিকার উন্নয়ন। আমরা কেউই দুনিয়ায় থাকবো না, কিন্তু আমাদের কৃতকর্ম যেন মানুষের মুখে মুখে থাকে সেরকম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। মর্জিনা আক্তার এগিয়ে চলেছেন দুর্বার গতিতে। সত্যিকার নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তিনি এখন পরিচিতি পেয়েছেন মহাদেবপুর উপজেলার গণমানুষের আদর্শ নেতা হিসেবে।

সময়ের সাহসী সৈনিক মুর্শিদা বেগম রুপালী

মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

ছোটবেলা থেকেই সমাজের প্রতি, সমাজের মানুষের প্রতি অসম্ভব রকম ভালবাসার টান অনুভব করতেন মুর্শিদা বেগম রুপালী। মানুষের উপকার করতে গিয়ে তাকে হজম করতে হয়েছে অনেক কথা, শুনতে হয়েছে অনেক বারণ। কিন্ত কোন বাধা-নিষেধই তাকে তার লক্ষ্য থেকে দূরে রাখতে পারেনি। খুব একটা ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান না হলেও এলাকার মানুষের সামান্য সেবা বা সহযোগিতা করার মত সামর্থ্য ছিল মুর্শিদার। তারচেয়ে বেশি ছিল সহযোগিতা করার মানসিকতা। মুর্শিদা ছোটবেলা থেকেই প্রতি কোন রকম অন্যায়-অবিচার দেখলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন। তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করতেন নির্যাতনের শিকার হওয়ার মানুষকে সহযোগিতা করতে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত যেখানেই তিনি কোনো অন্যায় হতে দেখেন, সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাকে বিপদও মোকাবিলা করতে হয়েছে, আবার বিপদের সময় অনেকেই তাকে দিয়েছেন সাহস, দিয়েছেন অনুপ্রেরণাও।

১৯৬৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি, নাটোর পৌরসভার উত্তর চৌকিরপাড় এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন মুর্শিদা বেগম রুপালী। পিতা মৃত মজিবুল হক খাঁন ও মাতা মোছাঃ দেলোয়ারা-এর চার সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। ভাই মোঃ সাজ্জাদ হোসেন সোহাগ বর্তমানে নাটোর পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার।

পঞ্চম শ্রেণি পাশের পর মুর্শিদা ভর্তি হন নববিধান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। লেখাপড়ার পাশাপাশি রবীন্দ্র সংগীত শুনতে এবং গাইতে পছন্দ করতেন। এসএসসি পাশের পরেই ১৯৮৪ সালের ১১ জানুয়ারি তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। তার স্বামী একই এলাকার মোঃ আতাউর রহমান। পেশায় একজন মৎস চাষী।

অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝে উঠতে তার বেশি সময় লাগেনি। আর তখন থেকেই জোরদার হয় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মুর্শিদার সংগ্রাম। অপরিণত বয়সে বিয়ের কারণে তার নিজের জীবনে যে ক্ষতি হয়েছে তা যেন আর কারো জীবনে না হয় সে বিষয়ে সারাক্ষণ সজাগ থেকেছেন তিনি। অর্থাৎ যেখানেই বাল্যবিবাহ সংঘটনের সংবাদ শুনতেন, সেখানেই তিনি ছুটে গেছেন অভিভাবকদেরকে এর কুফল সম্পর্কে বোঝাতে। তাদের বোঝানোর চেষ্টা করতেন যে, অল্প বয়সে কোনভাবেই মেয়েদের বিয়ে দেয়া ঠিক নয়। কারণ এতে তারা শিক্ষা ও পুষ্টির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি অল্প বয়সে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর মুর্শিদার এই সমাজ সচেতনতামূলক কাজে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা দেন তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন।

এভাবে সামাজিক বিভিন্ন কাজের সাথে থাকতে থাকতেই বিভিন্ন সংগঠনের সাথে তার পরিচয় ঘটে এবং সেসব সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করেন। কাজ করতে গিয়ে একসময় মুর্শিদার মনে ভাবনা জাগে, আজকের পৃথিবীতে উন্নয়ন ও সমতা যেখানে একে অপরের পরিপূরক, সেখানে আজও নারীর পছন্দ-অপছন্দ এবং ভালো-মন্দ সবকিছুই পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অথচ নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। এসব নানাবিধ প্রশ্ন সর্বদা তাকে অস্থির করে তুলছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে আলোর দিশা দেখানো এবং অজানা অনেক প্রশ্নের উত্তর তার সামনে তুলে ধরে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্স। উল্লেখ্য, স্থানীয় নারীনেত্রী রওশনা আরা শ্যামলীর আমন্ত্রণে মুর্শিদা ২০১১ সালের ২৮ অক্টোবর টিএমএসএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত (৭৬তম ব্যাচে) এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

মুর্শিদা জানান, প্রশিক্ষণের সূচনা হয় আন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে। অংশগ্রহণমূলকভাবে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ থেকে শিখেছি, 'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি' এবং এটিই আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বাক্য। তিনি বলেন, 'প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আগে মনে হতো নারীদের এই দৈন্যদশা বুঝি আর শেষ হবে না, নারীদেরকে বুঝি সারাজীবন অবহেলার পাত্র হয়েই থাকতে হবে। পুরুষরা মনে হয় সারাজীবন নারীদের ওপর জুলুম নির্যাতন করেই যাবে আর আমাদেরকে তা মুখ বুঝে, দেখেও না দেখার ভান করে সব সহ্য করতে হবে। কিন্ত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণের পর আমার সেই ধারণা পাল্টে যায়। পরিবর্তন আসে চিন্তার জগতে। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নির্যাতনের শিকার, নিপীড়িত নারী ও শিশুদের আইনি বিষয়াবলী সম্পর্কে অনেক স্পষ্ট ধারণা পাই। এখন আমি বিশ্বাস করি, নারীরাও পারে। তবে তাকে বিশ্বাস করতে হবে, আমার দ্বারা সম্ভব। অর্থাৎ আমি মনে করি, ক্ষমতায়ন অবশ্যই নিজের ভেতর থেকে আসতে হবে। সর্বোপরি নারীদেরকে স্বাবলম্বী হতে হবে অর্থাৎ নিজে কর্ম করার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আর নারীরা যখন উপার্জন করতে পারবে ঠিক তখনই পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজ নারীকে মূল্যায়ন করবে, যার মধ্য দিয়ে একজন নারীর প্রতি সামাজিক অবহেলা যেমন কমবে, তেমনি প্রতিষ্ঠিত হবে নারীর আত্মমর্যাদা।'

এই বিশ্বাসকে ধারণ করে মুর্শিদা এখন সমাজের পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে নির্যাতনের শিকার ও নিপীড়িত নারী ও শিশুদের আইনি এবং প্রশাসনিক সকল ধরনের সহযোগিতা করতে সচেষ্ট থাকেন। তিনি নারীর প্রতি সামাজিক ও পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন, সভা, উঠান বৈঠক, র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ইত্যাদি দিবস উদ্‌যাপন করে থাকেন। এছাড়াও যৌতুক ও বাল্যবিবাহের মত মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি ও অভিশাপ সম্পর্কে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন মুর্শিদা। বাল্যবিবাহ বন্ধে নিজে সক্ষম না হলে প্রয়োজনে প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে থাকেন তিনি।

২০১৪ সালে ঘোষিত হয় চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল। নির্বাচনের ডামাডোল বেজে উঠতেই এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ের নারীনেত্রীগণ তাকে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার ব্যাপারে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেন। নারীনেত্রীরা মুর্শিদাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, আপনি তো সমাজের মানুষের উপকার তথা মানুষের কল্যাণে বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন; নির্বাচনে জিততে পারলে আরও বেশি পরিমাণে, বড় পরিসর থেকে মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ তৈরি হবে। নাটোরের সাধারণ ভোটাররাও তাকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য অনুপেরণা যোগায়। অবশেষে সবার অনুপ্রেরণা আর নিজের মনোবলের ওপর ভর করে – যে মনোবল তাকে যুগিয়েছে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্স – তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র সমর্থনে ফুটবল মার্কা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে মুর্শিদা ৮২,৭৯৭ ভোট পেয়ে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে প্রায় ৩৫ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে নারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করে আসছেন মুর্শিদা। তার প্রচেষ্টায় উপজেলা পরিষদের বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় নারীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত নারীদের আর্থিক সহায়তা ছাড়াও তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পৌরসভার মাধ্যমে অনুদানকৃত নলকূপগুলো যেগুলো তার পক্ষে বরাদ্দ দেয়ার সুযোগ ছিল, সেই বরাদ্দকৃত

নলকূপগুলো এমন জায়গাতে বসানোর চেষ্টা করা হয়েছে বা বসানো হয়েছে যাতে নারীরা অবাধে যাতায়াত করতে পারে এবং পানি সংগ্রহ করতে পারে। সেগুলো তার পরিকল্পনা অনুসারে বসানো হচ্ছে কি-না তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি নিজে বরাদ্দকৃত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

এছাড়াও উপজেলা পরিষদ কর্তৃক কৃষি উপকরণ বিলির ক্ষেত্রে অতি দরিদ্র কৃষকদেরকে বেশি সুবিধা দেয়ার চেষ্টা করেছেন মুর্শিদা বেগম। এলাকার বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে উপকারভোগীদের নামের তালিকা সংগ্রহ করছেন তিনি এবং সংগৃহীত তালিকা সঠিক কি-না তা যাছাই করার জন্য নিজে সেগুলো আবার পরীক্ষা করে দেখেন। উপকরণ বিতরণের পরে সেগুলো আবার সঠিক লোকের হাতে গেছে কি-না তাও নিজে গিয়ে আবার নিশ্চিত করছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে স্বামী আর দু সন্তান নিয়েই মুর্শিদা বেগম রুপালীর সংসার। স্বামী মোঃ আতাউর রহমান মৎস ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত। ছেলে তানভির রহমান ইমন নাটোরের নবাব সিরাজউদৌলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে বর্তমানে চাকুরি করছে আর মেয়ে তানজিদা রহমান উপরোক্ত একই কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী।

মুর্শিদা বেগম রুপালী এখন নিজেকে অনেকটা স্বাবলম্বী মনে করেন। তাকে তার হাত খরচের জন্য স্বামী বা অন্য কারো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। তিনি তার নিজের আয় থেকে নিজের হাত খরচ চালাতে পারেন এবং ছেলে-মেয়েদের ছোট-খাট বায়না বা আবদার মেটাতে সক্ষম হন।

মুর্শিদা মনে করেন, সমাজের বিভিন্ন স্ত্ররে সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক সেবা গ্রহণে নারীদের সম-অংশগ্রহণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। তাই সমাজের প্রতিটি স্ত্ররে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে নারীদেরকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে হবে। তিনি বিশ্বাস করেন, আমাদের নারীদের সচেতন, সক্রিয় ও সংগঠিত করে তাদের ভেতরে লুকায়িত ক্ষমতা ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে একটি আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তাই বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে অবহেলিত নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি।

তাঁর একান্ত ইচ্ছা হলো– কোনো নারী যেন কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে থাকে। তারা যেন নিজ নিজ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সাবলম্বী হয়। তিনি মনে করেন, নারীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বিজয়ী হতে হলে তাদেরকে সংগঠিত হতে হবে। আর এজন্য তিনি পাড়ায় পাড়ায় নারী সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এর পাশাপাশি নিজ নিজ অবস্থান থেকে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে বাল্যবিবাহ ও যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার এবং পারিবারিক নির্যাতন বন্ধসহ নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তোলার বড় পরিকল্পনা নিয়েছেন মুর্শেদা বেগম রুপালী।

অন্ধকারে আশার আলো মোছাঃ জিয়াসমিন আক্তার

সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন

১৯৭৪ সালের ১৫ জুন। এদিন রাজধানীর দক্ষিণ বাড্ডায় বাবা এম এ মান্নান ও মাতা জবেদা বেগম এর কোলজুড়ে পৃথিবীর আলো দেখলো এক ফুটফুটে শিশু। ধীরে ধীরে ছোট্ট শিশুটি বড় হতে লাগলো। ছয় বছরে বয়সে বাবা তাকে ভর্তি করান বাড্ডা আলাতুন নেছা স্কুল এন্ড কলেজ-এ। কিন্তু বেশিদূর পড়ালেখা করার সুযোগ পায়নি মেয়েটি। কারণ তার ব্যবসায়ী বাবা মান্নান ১৯৮৫ সালে তাকে বিয়ে দেন টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার ঘিত্তরকোল নিবাসী মুক্তিযোদ্ধা ৩৫ বছর বয়সী মোঃ মিজানুর রহমান শহীদ-এর সাথে। যে মেয়েটি বিদ্যালয়ে উচ্চ লাফ (হাই জাম্প), লম্বা লাফ (লং জাম্প) ও নাচ দিয়ে সহপাঠীদের মাতিয়ে রাখত, সেই মেয়েটি মাত্র ১২ বছর বয়সেই পাঁচ বোন ও তিন ভাইয়ের সংসার ছেড়ে লাল শাড়ি পড়ে চলে আসেন নাগরপুর-এর ঘিত্তরকোল গ্রামে।

কিন্তু না! লেখাপড়া করে তার বড় হওয়ার স্বপ্নপূরণে আসেনি কোনো বাধা। কারণ শশুর মোঃ ইউসুফ আলী, শাশুড়ি নূরুন্নাহার ও স্বামীর অনুপ্রেরণায় গৃহবধূটি আবারো শুরু করেন লেখাপড়া। নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন নাগরপুর শহীদ শামসুল হক বালিকা বিদ্যালয়ে। শ্বশুর বাড়ি থেকে কোন বাধা না থাকায় মেয়েটি আবারো পুরো উদ্যমে শুরু করেন তার লেখাপড়া, নাচ ও গান। তিনি উপজেলা পর্যায়ে নাচ ও গান ইত্যাদিতে প্রথম হয়ে সবার মন কেড়ে নেন। এরই মধ্যে এসএসসি পরীক্ষা; সেই সময়ে পরীক্ষার মাত্র ৪০ দিন আগেই তার কোলজুড়ে আসে প্রথম সন্তান। আর সেই সন্তানকে কোলে নিয়ে তিনি ১৯৯০ সালে অংশগ্রহণ করেন এসএসসি পরীক্ষায়। সময়ের ধারাবাহিকতায় তিনি এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক পরিবারের বউ হিসেবে সেই সময় থেকেই তিনি জড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন রকম সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে, জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিতেও। তিনি ৫১ জন নারী নিয়ে গড়ে তোলেন 'ঘিত্তরকোল মহিলা কল্যাণ সমিতি'। একই সময় তিনি প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের পড়ানোর কাজ শুরু করেন।

যাকে নিয়ে এতক্ষণ লেখা হলো তিনি হলেন নাগরপুর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ জিয়াসমিন আক্তার জোসনা। তার আরেকটি পরিচয় রয়েছে তা হলো– তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক। জিয়াসমিন তার স্বামী, ননদ এবং তখনকার সময়ের গয়াহাটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল হোসেনের অনুপ্রেরণায় ঢাকার আগারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (২৩তম ব্যাচে) অংশগ্রহণ করেন। এরআগে একই প্রশিক্ষণে (১৯তম ব্যাচে) অংশগ্রহণ করেন তার স্বামী মিজানুর রহমান ও ননদ জবা। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের পরই জিয়াসমিন অংশগ্রহণ করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক (ভিটিআর) প্রশিক্ষণে (চতুর্থ ব্যাচে)।

জিয়াছমিন আক্তার জানান, উজ্জীবক প্রশিক্ষণ ও স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণই তার জীবনের গতিপথকে বেগবান করে। তিনি নিজেকে সামাজিক কাজের সাথে আরও বেশি পরিমাণে সম্পৃক্ত করেন। নিজেকে সম্পৃক্ত করেন বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথেও। ঐ সময়ে জিয়াসমিন জেলা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত গণশিক্ষা স্কুলে শিক্ষকতা এবং 'সারা' নামক একটি এনজিও-তে মাঠকর্মী হিসেবে কাজ করেন। এ সময় তিনি তার নিজের উদ্যোগে গড়ে তোলা ঘিত্তরকোল মহিলা কল্যাণ সমিতি'র কার্যক্রম আরও বেগবান করেন। তিনি তার সমিতির সদস্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেন বাল্যবিবাহ বন্ধ, শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ ও স্কুলে ভর্তি বিষয়ক বিভিন্ন উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযান। এছাড়াও তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে যে কাজটি করতে থাকেন তা হলো– প্রশিক্ষণের সাহায্যে নারীদেরকে দক্ষ এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলা।

এভাবেই জিয়াসমিন ধীরে ধীরে সমাজ উন্নয়মূলক কাজ ও রাজনীতিতে আরও সক্রিয় হয়ে উঠেন। তিনি তার শশুর, স্বামী, বড় ভাই খোরশেদ আলম ও পরিবারের অন্যান্যদের অনুপ্রেরণায় ২০০৮ সালে নাগরপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হন। এ নির্বাচনে জিয়াসমিন ২৮,০০০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। তিনি জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে তাকে শিখিয়েছে– কোনো ভালো কাজেই মনোবল না হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস অর্জন করতে হবে। তাই তিনি নির্বাচনে পরাজিত হয়েও ভেঙে পড়েননি। বরং অপেক্ষা করতে থাকেন দ্বিতীয়বার নির্বাচন করার। তিনি অনুধাবন করেন, নির্বাচনে তাকে জিততে হলে জনগণের ভালবাসা অর্জন করতে হবে, জনগণকে সম্পৃক্ত করে অব্যাহত রাখতে হবে উন্নয়নমূলক কাজ।

অপেক্ষার পালা শেষ হয়ে ২০১৪ সালে আসে চতুর্থ উপজেলা নির্বাচন। এ নির্বাচনে জিয়াসমিন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র সমর্থনে আবারো মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী হন। নির্বাচনে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ছিলেন সাত জন। জিয়াসমিন উপজেলা চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী প্রার্থীর চেয়েও বেশি ভোট (প্রায় ৪৯ হাজার) পেয়ে নির্বাচিত হন। তিনি বলেন, দলমত নির্বিশেষে সব দলের সহযোগিতা এবং মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কারণেই নির্বাচিত হতে পেরেছেন।

নির্বাচিত হবার পর জিয়াসমিন তার নির্ধারিত দাপ্তরিক কাজ ছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধ এবং নারীদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার কাজটিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে করে যাচ্ছেন। তিনি মনে করেন, নারীরা যত দ্রুত আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করবে, তত দ্রুত তারা নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে। আর এই বিষয়টিকে পাথেয় করে তিনি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে নারীদের দক্ষ কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করছেন। এই কাজের অংশ হিসেবে বিগত এক বছরে ১৮০ জনের মতো নারীকে সেলাই, এমব্রয়ডারী, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ ও মৎস চাষের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সাথে সাথে বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সহায়তায় ২০ জন নারীকে সেলাই মেশিন প্রদান করেছেন।

এছাড়া জিয়াসমিন বিভিন্ন কারণে নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের দায়ের করা মামলা পরিচালনায় এবং তা স্বশরীরে তদন্ত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছেন, যাতে নারীরা সুবিচার পায়। তিনি মনে করেন, নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ হলো বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহের কারণেই নারীরা শিক্ষা ও পুষ্টিসহ অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের ওপর নেমে আসে পারিবারিক নির্যাতন, ঘটে বিবাহ বিচ্ছেদ। তিনি বলেন, 'পুতুল নিয়ে খেলা আর কোলে শিশু নিয়ে পরিবারের দায়িত্ব নেয়া দুটি অব্যশ্যই আলাদা বিষয়। তাই ১৮ বছরের আগে কোনোমতেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।' তিনি মনে করেন, ছেলেরা যেমন স্বাবলম্বী হবার আগে বিয়ে করতে চায় না, তেমনি মেয়েদেরও উচিত স্বাবলম্বী হওয়ার পর বিয়ে করা। কারণ আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তার মতামত ব্যক্ত করতে পারে, অবদান রাখতে পারে নিজ পরিবার ও সমাজে।

জিয়াছমিন আক্তার ভবিষ্যতেও রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থেকে জনগণের সেবা করতে চান। তিনি চান সুশাসন এবং মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন গড়ে তুলতে। তার জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন তিনি। কিন্তু জিয়াসমিন মনে করেন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে থেকে জনগণের জন্য কাজ করার সুযোগ খুবই কম। কারণ এই পদটি শুধুমাত্র শোভাবর্ধনমূলক একটি পদ। তাই তিনি ভবিষ্যতে আসীন হতে চান আরও বড়

কোনো পদে। প্রসঙ্গত, জিয়াসমিন বর্তমানে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নাগরপুর উপজেলা কমিটির সভাপতি ও জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

দু মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে গড়া সংসার ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ছাড়াও জিয়াছমিন আক্তার জোসনা একজন লাইসেন্সধারী দলিল লেখক। তিনি স্বামীর ব্যবসা-বাণিজ্যের দেখভালের দায়িত্বও পালন করেন। তার নিজের সংসারটিকেও নিজের মনের মতো করে সাজিয়েছেন। তার সন্তানরা আজ লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে। এইভাবেই মাত্র ১২ বছর বয়সে বাল্যবিবাহের শিকার হওয়ার একজন নারী নিজের আত্মশক্তি ও পরিশ্রম দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং অবদান রাখছেন অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে।

জাহানারা রোজী: একজন সফল সংগঠক ও জনপ্রতিনিধি

এ এন এম নাজমুল হোসাইন

এই জাহানে গোলাপ ফুলের মতো সুগন্ধি ছড়াবে তাদের আদরের সন্তান, এ বিশ্বাস ও আশা থেকে বাবা আব্দুল মালেক মাস্টার ও মা রেজিয়া আক্তার সন্তানের নাম রাখেন জাহানারা রোজী। সময়ের পরিক্রমায় বাবা-মায়ের বিশ্বাস ও আশার স্বাক্ষরও রাখেন সেদিনের সেই মেয়েটি, যিনি বর্তমানে নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান।

৩১ শে জুন ১৯৭২ সাল। এ দিন নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার চিরাং ইউনিয়নের ছিলিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন জাহানারা রোজী। দু ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি পঞ্চম সন্তান। ছোটবেলা থেকেই দূরন্তপনা ও সুরেলা কণ্ঠের জন্য রোজী ছিলেন সকলের আদর আর স্নেহের। চার বছর বয়সে বাবার হাত ধরে কেন্দুয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি। বাল্যকালেই প্রতিভাত হয় রোজীর মেধা। সকল শ্রেণিতে প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পান তিনি। তারপর কেন্দুয়া জয়হরি স্প্রাই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন রোজী। ১৯৮৭ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করেন। বিদ্যালয়ে ভালো পড়ালেখার পাশাপাশি সঙ্গীতেও ছিলেন পারদর্শী। আর এজন্য স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় তিনি সবসময় দেশাত্মবোধক, নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, ভাটিয়ালী ও আধুনিক গানে প্রথম স্থান অর্জন করতেন।

রোজীর বাবা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, বিনিময়ে পেতেন খুবই অল্প বেতন। তাই ছয় সন্তানের লেখাপড়ার খরচ একসাথে জোগানো তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য ভালো ফলাফল অর্জন করা এবং কলেজে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও ১৯৮৮ সালে রোজীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯২ সালে ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার পূর্ব দোহাইর গ্রামের শেখ বাশারের সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়। রোজীর স্বামী শেখ বাশার মার্কিন দূতাবাসে কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করতেন। বিয়ের সময় রোজী বা তার পরিবার জানতেন না যে, বর একজন মানসিক রোগী। বিয়ের পরে তা জানতে পারলেও কিছুই করার ছিল না রোজীর। বরং তিনি তার এ নিয়তিকেই মেনে নেন। পারিবারিক উদ্যোগে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন কোনো এক অজানা কারণে তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। সেবা-ভালবাসা দিয়ে অসুস্থ স্বামীকে সুস্থ করার প্রাণান্তকর চেষ্টার পরও শ্বাশুড়ির মন যোগাতে পারেননি তিনি। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে বিয়ের এক বছর পূর্ণ না হতেই বাবার বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন রোজী। কিন্তু বিধি বাম, ১৯৯৩ সালে তার পিতার মৃত্যু তাকে আরও দূর্বিপাকে ফেলে দেয়।

তখন তিনজন ব্যক্তি– দৈনিক সমকাল-এর সাংবাদিক সমরেন্দ্র বিশ্বশর্মা, অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান ভূঁইয়া এবং অ্যাডভোকেট আব্দুল কাদির ভূঁইয়া-এর সহযোগিতায় ও অনুপ্রেরণায় ১৯৯৩ সালে স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত হন রোজী। বাবার মৃত্যুর পর এলাকার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (চেয়ারম্যান ছিলেন একজন নারী) রোজীর বিভিন্ন সামাজিক কাজ দেখে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা তৈরি করে তার জীবনকে দূর্বিসহ করে তোলে। রোজীর বড় মেয়েকে স্কুলে যেতে চেয়ারম্যানের লোকেরা বাধা দিত। এতে রোজীর মেয়ের বিদ্যালয়ে যাওয়া ব্যাহত হয়। এমনকি রোজীর নামে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ রটিয়ে তাকে সামাজিকভাবে হেয় করার চেষ্টা করে ঐ চেয়ারম্যান। এ ধরনের দূর্বিসহ জীবনে ১৯৯৮ সালে তিনি কেন্দুয়া উপজেলার লিগাল এইড কমিটির সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন। এরপর একের পর এক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেকে জ্ঞানে ও মানে সমৃদ্ধ করতে থাকেন।

২০০৬ সালে সাংবাদিক সমরেন্দ্র বিশ্বশর্মা-এর আমন্ত্রণে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ এবং একই বছর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন রোজী। প্রশিক্ষণ দুটি জীবনের নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত করে তার সামনে। তিনি অনুধাবন করেন, সমাজের প্রতি তারও দায়বদ্ধতা রয়েছে। এ দায়বদ্ধতা থেকে তিনি ৪০টি বাল্যবিবাহ ও ৭৮টি নারী নির্যাতন বন্ধ করা, আটটি বিবাহ নিবন্ধন করার পাশাপাশি ৫৫ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি, ১২৫

জন শিশু ও ১৮৭ জন মাকে টিকা প্রদান, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ১২ জন শিশুকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি, এক জন প্রতিবন্ধী শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছেন জাহানারা রোজী। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা প্রসারে হাসিনা সাহিদা কিন্ডার গার্ডেন ও নিম্ন মাধ্যমিক মডেল একাডেমীতে ৫০ হাজার টাকা অনুদান, নিজ অর্থে একটি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় কেন্দুয়া আত্মকর্মসংস্থান বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিমাসে এ সমিতি থেকে গড়ে তার আয় হয় প্রায় ২৫ হাজার টাকা। এছাড়া দু একর কৃষিজমি হতে আয় ছাড়াও স্বামীর ব্যবসা থেকে (স্বামী বর্তমানে সুস্থ) পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হয়। রোজীর দু মেয়ে। বড় মেয়ে নুপুর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে তৃতীয় বর্ষে এবং ছোট মেয়ে লোপা চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যায়নরত।

২০০৮ সালে তিনি জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম উপজেলা কমিটির সহ-সভাপতি মনোনীত হন। ২০০৭-২০১০ এবং ২০১০-২০১৪ সাল পর্যন্ত দু বার উপজেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রোজী। একই সময় জেলা পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, থানা কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির একমাত্র নারী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০১০ সালে নেত্রকোনা জেলায় ছয়জন নারী সংগঠক-এর মধ্যে কেন্দুয়া উপজেলার শ্রেষ্ঠ নারী সংগঠক হিসেবে নির্বাচিত হন রোজী । ২০১৪ সালে জেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ হতে সম্মাননা স্মারক পান তিনি।

শুধুমাত্র পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েই থেমেই যাননি জাহানারা রোজী। জনমানুষের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তার উন্নয়নমূলক কাজকে আরও এগিয়ে নেয়ার বাসনায় ২০১৪ সালে কেন্দুয়া উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হন। ভোটাররা তাকে হতাশ করেননি। ৬০,৫১৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন জাহানারা রোজী। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি জানান, বাবার মৃত্যুর পর এলাকার স্থানীয় (নারী) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে তার জীবনকে দূর্বিসহ করে তোলেন। তাই তিনি নির্বাচিত হয়ে ঐ চেয়ারম্যানের মত নয়, বরং এলাকার জনগণের জীবনযাত্রা সহজ করবেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের কর্মচারী হিসেবে কাজ করবেন– এমন দৃঢ় সংকল্প নেন।

রোজী বর্তমানে উপজেলা স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে আটটিরই সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। রোজী বলেন, ‘জনগণ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা আমি সঠিকভাবে পালন করতে চাই এবং জনগণের রাজস্ব এবং সরকার প্রদেয় সম্মানির যথাযথ ব্যবহার করতে চাই।’

ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর ইতোমধ্যে তিনি ১২টি বাল্যবিবাহ, ২৬টি নারী নির্যাতন বন্ধ করার পাশাপাশি দুটি সড়ক তৈরি, ছিলিমপুর জামে মসজিদ সংস্কারসহ কয়েকটি মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন, জেলা ও উপজেলা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে এক শ’টির-ও বেশি সভায় অংশগ্রহণ এবং ১২টি স্থানীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন।

জাহানারা রোজী জানান, ভবিষ্যতে কোনো নারী যেন নির্যাতনের শিকার ও বঞ্চিত না হয় এজন্য ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে নারী উন্নয়ন কমিটি গঠন এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে চান তিনি। সমাজ থেকে দূর করতে চান জুয়াখেলা, গড়তে চান মাদকমুক্ত সমাজ। সকল দরিদ্র শিশুরা যেন শিক্ষা ও সুস্থ বিনোদন থেকে বঞ্চিত না হয়, সে লক্ষ্যেও কাজ করতে চান জাহানারা রোজী।

নারীদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করতে সদা সচেষ্ট কানিজ ফাতেমা

সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন

টাঙ্গাইল জেলার একটি সমৃদ্ধ উপজেলা ঘাটাইল। ছোট ছোট টিলা ও গাছ-গাছালি, শহীদ সালেহ উদ্দিন ক্যান্টমেন্ট এই উপজেলা সমৃদ্ধ করেছে। আর এই উপজেলা পরিষদের দুই দুই বারের নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কানিজ ফাতেমা, যাকে এলাকার সবাই বিউটি শিখা নামেই চিনে।

১৯৭২ সালের ৩ জুন। এ দিন ঘাটাইল উপজেলার চৈথট্র গ্রামের মীর অসিম উদ্দিন ও জোবেদা বেগম এর কোলজুড়ে আসে এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান। বাবা-মা নাম রাখেন কানিজ ফাতেমা। আদর করে ডাকতেন বিউটি শিখা। তিন বোন, এক ভাই ও বাবা-মা সহ বিউটি শিখাদের সংসার। গুটি গুটি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কানিজ ফাতেমা ভর্তি হলেন চৈথট্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এখানকার লেখাপড়া শেষে ভর্তি হলেন চৈথট্র উচ্চ বিদ্যালয়ে।

১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাস। সপ্তম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই বাবা-মা আদরের ছোট মেয়ে বিউটি শিখাকে বিয়ে দিয়ে দেন ঘাটাইল নিবাসী সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত সাইফুর রহমান বাদল-এর সঙ্গে। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই তিনি নববধূ হয়ে চলে আসেন শ্বশুর বাড়িতে। বিয়ে হয়ে গেলেও থেমে যায়নি বিউটি শিখার লেখাপড়া। ভর্তি হন ঘাটাইলের ইউসুফ সালেহ জাই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। লেখাপড়া অবস্থায় ১৯৮৭ সালে বিউটির কোলজুড়ে আসে তাদের প্রথম সন্তান। সন্তান কোলে নিয়েই বিউটি ১৯৮৮ সালে অংশগ্রহণ করেন এসএসসি পরীক্ষায়। কিন্তু পরীক্ষা দিয়েও উত্তীর্ণ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। থেমে যায় বিউটির এগিয়ে চলা।

এরই মধ্যে পরিচয় ঘটে তার স্বামীর বন্ধু ঘাটাইলে রতনপুর গ্রামের সিরাজুল হক বাদল-এর সাথে। সিরাজুল হক বাদল-এর আহ্বানে ২০০১ সালে রতনপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ৫০তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন বিউটি শিখা। তিনি বলেন, সে দিনের সেই উজ্জীবক প্রশিক্ষণই আমাকে নতুন করে পথচলা শেখায়। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ শেষে গৃহবধূ বিউটি তার মানসিকতা পরিবর্তন করে বেরিয়ে আসেন ঘরের বাইরে, অংশ নিতে থাকেন বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে। সিরাজুল হক বাদল ও বিউটি শিখার নেতৃত্বে ঘাটাইলে এগিয়ে চলে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আন্দোলন যেমন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন বন্ধ করা এবং শিশুদের স্কুল ভর্তিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযান ইত্যাদি। এছাড়া আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০০৫ সালে মানিকগঞ্জের কৈট্টায় বিউটি শিখা অংশগ্রহণ করেন (১০তম) স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক (ভিটিআর) প্রশিক্ষণে।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেয়ার আগে বিউটি কখনো কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করলেও এরপর থেকেই বদলে যায় তার জীবন। সমাজের মানুষদের কীভাবে আরও এগিয়ে নেয়া যায় এবং বড় পরিসরে কীভাবে কাজ করা যায় তা নিয়ে নিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন। এমন ভাবনা থেকে স্বামীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় জাতীয় পার্টির সমর্থনে ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত ঘাটাইল উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হন বিউটি শিখা। চার জন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর মধ্যে বিউটি শিখা ৫৭,৪০০ ভোট পেয়ে প্রথমবারের মতো মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তিনি তার দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে পালন করেন। ২০১৪ সালে আসে চতুর্থ উপজেলা নির্বাচন। দল পরিবর্তন করে এবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমর্থনে তিন জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৫,৭৫৩ ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বারের মতো উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বিউটি শিখা।

নির্বাচিত হবার পর তিনি ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বিষয় হলো আত্মনির্ভরশীল হওয়া। আজ সমাজে নারী ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক– তার সবকিছুর অন্যতম কারণ হলো– নারীদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে না ওঠা। সুতরাং সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার দূর করার জন্য প্রয়োজন নারীকে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। কারণ

নারীরা সুশিক্ষিত হলে তবেই তাদের জন্য সম্মানজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। আর একজন নারী যখন শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হয় তখন আশেপাশের অনেক নারীকেই সে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে। এ লক্ষ্যে তিনি স্থানীয় নারীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকার উঠান বৈঠক ও কর্মশালা পরিচালনা করছেন।

উজ্জীবক স্বামী সাইফুর রহমান, ইয়ূথ লিডার ছেলে এবং পুত্রবধূ এই চারজনের ছোট সংসার বিউটি শিখার। তিনি তার সবধরনের কাজে স্বামীর কাছ থেকে সহযোগিতা পান এবং এ কারণেই তার এগিয়ে যাবার পথে কোন বাধা নেই বলে মনে করেন। বিউটি শিখা জানান, ২০০১ সালের সেই উজ্জীবক প্রশিক্ষণই তাকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ জ্ঞানগুলোকে পদে পদে কাজে লাগিয়ে তিনি তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তিনি মনে করেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে থেকে কাজ করার সুযোগ কম। তাই তিনি ভবিষ্যতে বসতে চান আরও বড় আসনে, কাজ করতে চান বড় পরিসরে।

বিউটি শিখা বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সাথে সম্পৃক্ত হবার কারণে আজ আমি দুই দুইবার উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি। কারণ এ সংস্থাই আমাকে শিখিয়েছে– প্রতিটি মানুষ অমিত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জন্মগতভাবে সেই অমিত সম্ভাবনাই তাকে করতে পারে দারিদ্র্যমুক্ত এবং আত্মনির্ভরশীল। মানুষ যদি তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার সৃজনশীল বিকাশের সুযোগ পায়, সে যদি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়, তাহলে সে নিজেই তার ভাগ্যোন্নয়নের দায়িত্ব নিতে পারে। নিজ ভবিষ্যতের কারিগরে পরিণত হতে পারে।'

নারীদের সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করার স্বপ্ন বুলু রায় গাঙ্গুলীর

মাহবুব-উল-আলম বুলবুল

বুলু রায় গাঙ্গুলী। তার একাধিক পরিচয়। তিনি উজ্জীবক, বঞ্চিত ও অসহায়ের আশ্রয়স্থল এবং খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দিয়ে তিনি প্রথমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বর্তমানে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রেখে চলেছেন।

বুলু রায় ১৯৬৬ সালের ১৯ জুন বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা ইউনিয়নের তেতুলতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দু ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। বাবা হরিদাস গাঙ্গুলী, যিনি খুলনায় জেলা ভূমি কর্মকর্তা (এসি ল্যান্ড) হিসেবে চাকুরি করতেন। সে সূত্রে খুলনার গগনবাবু রোডে বুলু রায়-এর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। ১৯৭৯ সালে খুলনার পাইনিয়র স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন তিনি। সময়ের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালে বয়রা মহিলা কলেজ থেকে বিএ পাশ এবং ঐ বছরই বটিয়াঘাটা উপজেলার দেবীতলা গ্রামের বিকাশ চন্দ্র রায়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন বুলু রায়। তার স্বামী উত্তরা ব্যাংক খুলনা শাখার প্রিন্সিপল অফিসার ছিলেন।

স্কুলকালীন তিনি ব্লু বার্ড-এর সাথে এবং কলেজে পড়া অবস্থায় বিএনসিসি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে দেবীতলা গ্রামের এক গৃহবধূকে হত্যার প্রতিবাদে বুলু রায় এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে সংগঠিত করে উপজেলা নির্বাহী নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং দোষী ব্যক্তির দ্রুত শাস্তির দাবি জানান। ফলশ্রুতিতে দোষী ব্যক্তির সাজা হয়। এ ঘটনার পর স্থানীয় পর্যায়ে বুলু রায়-এর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

১৯৯৬ সালে বুলু রায় ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হন এবং ইউপি সদস্য হিসেবে জয়লাভ করেন। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি স্থানীয় মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন।

বুলু রায় ২০০১ সালে বটিয়াঘাটা খগেন্দ্রনাথ কলেজে অনুষ্ঠিত দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই সামাজিক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকলেও উজ্জীবক প্রশিক্ষণ তার মধ্যে মানুষের জন্য আরও বেশি পরিমাণে কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগায়। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা, তাদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করে সকল প্রকার বৈষম্য রোধ এবং বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে ভূমিকা পালনের পরিকল্পনা নেন। তিনি মনে করেন, এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে নারীদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদেরকে সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করতে হবে। এমন অনুধাবন থেকে তিনি বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) কাজে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া ও তাদের উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেন।

বুলু রায় একজন উজ্জীবক। এটা মাথায় আসলেই তার মনে হয়, উজ্জীবক মানেই একজন উজ্জীবিত নেতা, যিনি পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কাজ করতে সদা উজ্জীবিত। প্রসঙ্গত, তিনি ২০০৪ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে-এর নারী পরিচালক (ডিরেক্টর) পদে দায়িত্ব পালন করেন।

২০১৪ সালে উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের বিশেষ অনুরোধে তিনি চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফলশ্রুতিতে বুলু রায় প্রথমেই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর নারীনেত্রী ও উজ্জীবকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় উজ্জীবক ও নারীনেত্রীগণ তাকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য সমর্থন ও অনুপ্রেরণা যোগান। সভার সিদ্ধান্তের পর বুলু রায় নির্বাচনে প্রার্থী হন এবং ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যান। এর ফলস্বরূপ তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

নির্বাচনে জয়লাভের পর বুলু রায়-এর কাজের পরিধি বেড়ে যায়। বিশেষ করে অসহায় ও অবহেলিত নারীদের জন্য তিনি তার যথাসাধ্য সহযোগিতার হাত বাড়ান। ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে বটিয়াঘাটা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের হাটবাটি গ্রামের শুষেন সরকারের স্কুল পড়ুয়া মেয়ে মৌমিতা সরকারের বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে যায়। এমন সংবাদ শোনার পর তিনি স্থানীয় নারীনেত্রীদের নিয়ে মেয়ের বাবাকে বাল্যবিবাহের কুফল বোঝাতে সক্ষম হন, যার ফলশ্রুতিতে মৌমিতা সরকারের বিয়ের আয়োজন বন্ধ হয় এবং টিকে থাকে তার লেখাপড়া করে বড় হওয়ার স্বপ্ন। এভাবে বুলু রায় উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে তার উপজেলা থেকে বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বন্ধসহ নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীকে অগ্রাধিকার দেয়াসহ নানাবিধ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

বুলু রায়ের দৃঢ় অঙ্গীকার– এলাকার নারীদেরকে শিক্ষিত ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া। তিনি মনে করেন, তার সকল সফলতার পিছনে মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। যে প্রশিক্ষণ থেকে তিনি শিখেছেন– প্রতিটি মানুষই অমিত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সেই অমিত সম্ভাবনাই তাকে করতে পারে দারিদ্র্যমুক্ত এবং আত্মনির্ভরশীল। অর্থাৎ 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দারিদ্র্য থাকতে পারে না।' তিনি বিশ্বাস করেন, সবাই যদি উপরোক্ত বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন– তবে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবেই।

অ্যাডভোকেট পারভিন খানমঃ একটি প্রেরণার নাম

মোঃ মনিরুজ্জামান মোল্লা

প্রতিকূলতার হাজারও বাধা পেরিয়ে একজন নারী সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ– বাগেরহাট জর্জ কোর্টের অ্যাডভোকেট বাগেরহাট সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পারভিন খানম। জন্ম ১৯৭০ সালের ৬ জানুয়ারি বাগেরহাট পৌরসভার সরুই গ্রামে। বাবা মৃতঃ মোঃ শামছুল হক একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মা সায়েরা হক একজন আদর্শ গৃহিণী।

বাড়ির কাছেই সম্মিলনী বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু। ১৯৮৬ সালে বাগেরহাট সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাশ করেন পারভিন। ১৯৮৭ সালে তিনি ভর্তি হন বাগেরহাট সরকারি পি.সি. কলেজে। ১৯৮৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার দোরগোড়া পার হওয়ার পূর্বেই তার বিয়ে হয়ে যায়। স্বামীর নাম এসএম ফারুক আহমেদ মনি– একজন ব্যবসায়ী এবং ক্রীড়া সংগঠক। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি চলে আসেন। একান্নবর্তী পরিবার। তার ওপর রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার। অনেক প্রথা, অনেক নিয়ম। সবার মন যুগিয়ে চলতে হয়। এক সময় লেখাপড়া হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। শ্বশুরবাড়ির কেউ-ই চান না লেখাপড়া করে বাড়ির বউ চাকুরি করুক। পারভিন শ্বশুরবাড়ির লোকদের লেখাপড়ার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেন। বিশেষ করে তার বিদুষী শ্বাশুড়ি মায়ের সহযোগিতায় চাকুরি না করার শর্তে আবার লেখাপড়া শুরু করেন পারভিন। পারভিন ছিলেন বিজ্ঞান বিভাগে। কারণ বাবার আশা ছিলো মেয়ে বড় ডাক্তার হবে। সে আশা ছেড়ে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ইচ্ছায় বাগেরহাট সরকারি গার্লস কলেজে মানবিক বিভাগে ভর্তি হন। সেখান থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এইচএসসি পাশ করেন পারভিন। এরপর সরকারি পিসি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে বিএ পাশ করেন তিনি। ততদিনে তার কোলে আসে প্রথম সন্তান। কিন্তু তারপরও থেমে যাওয়া নয়। সন্তান কোলে নিয়েই পারভিন এমএ- তে ভর্তি হন রাজধানীর জগন্নাথ কলেজে (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়)। সেখান থেকে দর্শন শাস্ত্রে এমএ পাশ করেন। সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পরও পরিবারের শর্ত চাকুরি করা যাবে না। তাই তিনি স্বাধীনভাবে কিছু করার ইচ্ছায় বাগেরহাট আইন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু প্রথম পাঠ শেষ করে তার আর পড়া সম্ভব হয় না। কারণ কেউ চায় না পারভিন কোর্টের বারান্দায় পা রাখুক।

এর দশ বছর পরের কথা। ততদিনে কোলে এসেছে দ্বিতীয় সন্তান। আবারো তিনি ভর্তি হন বাগেরহাট আইন কলেজে। এবার তিনি কৃতিত্বের সাথে আইন পাশ করেন। অবশেষে সব বাধা পেরিয়ে বাগেরহাট জর্জ কোর্টে অনুশীলন (প্র্যাকটিস) শুরু করেন পারভিন।

লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি ছোটবেলা থেকেই যুক্ত থাকেন নানা সামাজিক কার্যক্রম ও সংগঠনের সাথে। তৃতীয় শ্রেণি পড়া অবস্থায় যুক্ত হন "চৈতী খেলা ঘর"-এর সাথে। সেই ৮০'র দশকের কথা। ষষ্ঠ শ্রেণিতে সরকারি গার্লস স্কুলে এসে যুক্ত হন সেবা সংঘ "হলদে পাখি"র টিম লিডার হিসেবে। ৮৪-তে "বাগেরহাট যুব রেড ক্রিসেন্ট"-এর সদস্য হন। ৮৪-তে "মিউজিক একাডেমি বাগেরহাট"-এর সংগীত বিভাগে যোগ দেন। এরপর বাগেরহাট শিল্পকলা থেকে কবিতা এবং নাটক বিভাগে প্রশিক্ষণ নেন। ৮৭ সালে "কণ্ঠস্বর আবৃত্তি" সংগঠনে যোগ দেন। ৮৭ সালে বাগেরহাট বিএনসিসি'র গার্লস লিডার নিযুক্ত হন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ-এর সঙ্গে যুক্ত হন ১৯৯৫ সালে। তখন থেকে পারভিন ভাবতে থাকেন মেয়েদের শুধু লেখাপড়া করলেই হবে না। কিছু আর্থিক রোজগার থাকা দরকার। সেই ভাবনা থেকে 'নিপুন ফ্যাশন হাউজ' নামে একটি বুটিকের শো-রুম খোলেন তিনি, যা সারা বাগেরহাট শহরে সাড়া ফেলে দেয়। ২০টি মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী তাদের হাতের কাজ বপনের সুযোগ পান এখানে।

২০০২ সালের কথা। স্থানীয় উজ্জীবক আসাদ-এর অনুপ্রেরণায় খুলনা শহরের খালিশপুরে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন পারভিন। এই প্রশিক্ষণ তার পুরানো পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা বদলে দিয়ে জীবন চলার

পথে নতুন মাত্রা যোগ করে। দেশের জন্য, মানুষের জন্য কিছু করবার প্রবল তাগিদ বোধ করেন তিনি। 'জোরের নয়, চাই যুক্তির বাংলাদেশ' – এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পারভিন তার পরিচালনায় বাগেরহাটে গড়ে তোলেন "ডিবেটিং সোসাইটি"। সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য শিশু-কিশোরদের নিয়ে গড়ে তোলেন প্রমিত বাংলা উচ্চারণ ও কবিতা আবৃত্তির সংগঠন 'কণ্ঠ সৃজন'। ২০০২ সালে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে (২২তম ব্যাচে) প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ তাকে সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। তার মধ্যে তৈরি করে দৃঢ় প্রত্যয়। সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে তিনি হন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি অনুধাবন করেন, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তাকে যেতে হবে আরও অনেকদূর। তাই তিনি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে চান এবং দাঁড়াতে চান সমাজের অবহেলিত, বিশেষ করে নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের পাশে। তাদের জন্য তৈরি করতে চান কর্মসংস্থানের সুযোগ। এরই ফলশ্রুতিতে নিজের ঐকান্তিক ইচ্ছা আর স্বামীর সহযোগিতায় ২০১৪ সালে বাগেরহাট সদর উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে তিনি মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হন। প্রথমবারই তার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে জনগণ। বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন তিনি। নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে পারভিন জেলার মাসিক উন্নয়ন সভাগুলোয় নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি সভায় তার মতামত গুরুত্ব পেয়ে থাকে। সদর উপজেলার ১৭টি স্থায়ী কমিটির ১০টিতেই তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

নারী উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে পারভিন রেখে চলেছেন এক অনন্য অবদান। তিনি বর্তমানে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক বাগেরহাট জেলা কমিটির সভাপতি এবং সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক। সম্প্রতি পারভিন নির্বাচিত হয়েছেন 'উপজেলা নারী ফোরাম'-এর চেয়ারম্যান।

পারভিন খানম-এর একান্ত ইচ্ছা– বাগেরহাট সদর উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে তিনি তার উপজেলা থেকে প্রসূতি মা ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক নিরোধ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জনগণকে সচেতন করে চলেছেন তিনি। নিজ নেতৃত্বে বয়ঃস্বন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে প্রতিটি স্কুলের কিশোরীদের সংযুক্ত করে কর্মশালা করে চলেছেন পারভিন। স্থানীয় নারীদের আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে উপজেলা কমিটি গঠিত হয়েছে তিনি সেই কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। উপজেলা কৃষি অধিদপ্তর থেকে কৃষকদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সেখানে যাতে সমানসংখ্যক কৃষাণীকে যুক্ত করা হয় সে নিয়ম পালন করা তিনি বাধ্য করে দিয়েছেন।

অ্যাডভোকেট পারভিন খানম এখন অনেকটাই পরিপূর্ণ। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে তিনি আজকের পর্যায়ে আসতে পেরেছেন। এখন তার মনোবল বেড়েছে, বেড়েছে জনসমর্থন। আর এটিকে অবলম্বন করেই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যেই কাজ করে যেতে চান তিনি। এটাই উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও নারীনেত্রী অ্যাডভোকেট পারভিন খানম-এর অঙ্গীকার।

শেকড় থেকে শিখরে আজ লক্ষ্মী সরকার

নেসার আমিন

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া। মধুমতি নদীর তীরে শাখা নদী বাঘের পাটগাতির পরেই এর অবস্থান। কোনো কবি এখানে এলে রূপসী বাংলাকে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। তখন কবির কাব্যে প্রকৃতি নতুনতর রূপে অঙ্কিত হবে। তার চোখে পড়বে গাঁয়ের মেঠো পথের পাড়ে অবস্থিত সব ঝিল আর বিল, যেখানে ফুটে রয়েছে কত না শাপলা-শালুক-পদ্মফুল। এই টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সময়ের পরিক্রমায় এই উপজেলায় জন্ম নিয়েছেন আরও কিছু সাহসী মানুষ, যারা রাজনীতি করছেন জনমানুষের কল্যাণে। তাদেরই একজন লক্ষ্মী সরকার।

তিনি রাজনীতি করবেন এবং আইনজীবী মানুষের জন্য। দাঁড়াবেন অসহায়, বঞ্চিত ও নির্যাতনের শিকার মানুষের পাশে। এটাই ছিল লক্ষ্মী সরকার-এর ছোটবেলার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন এখন আর শুধুই স্বপ্ন নয়, বরং বাস্তব সত্য। তিনি আজ একজন জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান।

১৯৭০ সালের ০১ জানুয়ারি, টুঙ্গীপাড়া উপজেলার (গোপালগঞ্জ জেলা) গোপালপুর গ্রামের (যাকে অজপাড়াগাঁ বলা যায়) এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন লক্ষ্মী সরকার। বাবা মনোরঞ্জন সরকার আর মা সুন্দরী সরকার। হিন্দু ধর্ম মতে, ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী। তাই পিতা-মাতা ক্ষণজন্মা এ মেয়েটির নাম রাখেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মী সরকার-এর বাবা কৃষিকাজ করতেন এবং এর মাধ্যমেই সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। পরিবারে ছয় ভাই-বোনের মধ্যে লক্ষ্মী সরকারই সবার বড়।

শৈশব থেকেই সংগ্রাম করে বড় হতে হয়েছে লক্ষ্মী সরকারকে। নিজের লেখাপড়ার পাশাপাশি পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করা এবং ছোট ভাই-বোনদেরও লেখাপড়ায় সহায়তা করতেন তিনি। লক্ষ্মী সরকার-এর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় গোপালপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়া পাঠশালায়। গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তিনি পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে ভর্তি হন গোপালপুর পঞ্চপল্লী উচ্চ বিদ্যালয়ে। তিনি জানান, লেখাপড়া করার জন্য তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অর্থাভাবে কখনো প্রাইভেট পড়তে পারেননি। তার মা ঢেঁকিতে ধান বানতেন, আর ঐ আলোতে তিনি পড়তেন। আবার কখনো পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলোয় বই পড়তেন।

লক্ষ্মী সরকার-এর ছিল প্রখর মেধা। এমনও দেখা গেছে যে, অন্য কাউকে পড়তে শুনলেই তার ঐ পড়া মুখস্ত হয়ে যেত এবং তিনি হুবহু তা পরীক্ষায় লিখতে পারতেন। স্কুলজীবনে লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি কবিতা লিখতেন এবং বিভিন্ন খেলাধুলায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৮৬ সালে লক্ষ্মী সরকার এসএসসি পাশ করেন। এরপর গোপালগঞ্জ মহিলা কলেজ (বর্তমানে এ কলেজের নাম শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ) থেকে ১৯৮৮ সালে এইচএসসি পাশ করেন তিনি।

১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এবং কোটালীপাড়া উপজেলার শুয়াগ্রাম ইউনিয়নের রণজিৎ মধু-এর সাথে লক্ষ্মী সরকার-এর বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে এসেও তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যান। যার ফলস্বরূপ তিনি ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গোপালগঞ্জ সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে লক্ষ্মী সরকারই একমাত্র বিএ পাশ করেন। এমনকি পুরো গোপালপুর ইউনিয়নে তিনিই প্রথম বিএ পাশ মেয়ে এবং

স্বামীর ইউনিয়ন শুয়াগ্রাম ইউনিয়নের প্রথম বিএ পাশ বধূ। বিএ পাশ করার পর লক্ষ্মী সরকার আইন পড়ার জন্য ঢাকায় আসলেও অর্থাভাবে তা সম্ভব হয়নি।

লক্ষ্মী সরকার-এর লেখাপড়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান তার মায়ের। মা অনেক কষ্ট করে তার লেখাপড়ার খরচ যোগাতেন। তিনি চাইতেন যে, তার মেয়ে শিক্ষিত হয়ে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠুক, যে নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নেও অবদান রাখবে। কারণ লক্ষ্মী সরকার-এর মা নিজে শিক্ষার আলো দেখেননি। তাই লেখাপড়া করলে মেয়ে শিক্ষিত হয়ে স্বাবলম্বী হবে এবং নির্যাতনের শিকার হবে না– এমন ধারণা ছিল তার। বাবা মনোরঞ্জন সরকারও লক্ষ্মী সরকারকে লেখাপড়া করার অনুপ্রেরণা যোগাতেন।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ছাত্রজীবন থেকেই (১৯৮৬ সাল থেকে) লক্ষ্মী সরকার রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ও সদস্য হিসেবে সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন। প্রসঙ্গত, তিনি লক্ষী সরকার সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ ছাত্র সংসদের জি.এস. ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের উপজেলার কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক। ১৯৯৭ সালে লক্ষ্মী সরকার যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর-বিনসিসি'র সাথেও। লেখাপড়া ও রাজনীতির পাশাপাশি তিনি অনেক নাটকে অভিনয় করেন। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন ভালো বক্তা ও উপস্থাপক। তার আরও একটি বড় গুণ ছিল তা হলো– কাউকে বিপদে-আপদে এবং অসুখ-বিসুখে পড়তে দেখলে সব বাধা উপেক্ষা করে তার সাহায্যে সবার আগে তিনি এগিয়ে যেতেন।

এসএসসি পরীক্ষায় পাশের পর লেখাপড়ার খরচ চালানোর জন্য তিনি একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা খ্রীষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ-সিসিডিবি-তে হিসাবরক্ষক হিসেবে চাকুরি নেন। এরপর দীর্ঘ ১৫ বছর তিনি ব্র্যাক, জাগরণী সংস্থা এবং রুরাল ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ ইত্যাদি সংস্থায় চাকুরি করেন।

১৯৯৭ সালের প্রথমদিকে একটি মতবিনিময় সভায় যোগ দিতে গোপালগঞ্জ আসেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। লক্ষ্মী সরকার-এর সুযোগ হয় সে মতবিনিময় সভায় যোগ দেয়ার। সভায় ড. মজুমদার বলেন, 'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি'। তাই তাদেরকে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হতে হবে এবং সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব নিতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে আত্মশক্তি। এ আত্মশক্তি কাজে লাগিয়ে যে কেউ হতে পারে নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের কারিগর।' ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর এসব বক্তব্য শোনার পর লক্ষ্মী সরকার নিজের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা অনুভব করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন শুয়াগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হওয়ার। সে বছরই অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লক্ষ্মী সরকার ঐ পদে বিজয়ী হন।

নির্বাচিত হওয়ার কয়েক মাস পর (২০০৭ সালে) তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (৮ম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে লক্ষ্মী সরকার শিখেন যে, জীবনে যত বাধাই আসুক তা সাহসের সাথে মোকাবিলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে রয়েছে বিপুল আত্মশক্তি। প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা তার জানার পরিধি বাড়িয়ে দেয়। জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে মেলে ধরার কৌশল আয়ত্ব করেন তিনি।

এর এক বছর পর ১৯৯৮ সালে লক্ষ্মী সরকার অংশগ্রহণ করেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন– বিরাজমান সমাজে নারীদের অবস্থা, অবস্থান, তাদের প্রতি নির্যাতনের কারণ এবং প্রতিকারের উপায়। তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, নিজেদের অসচেতনতা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই নারীর এগিয়ে চলার পথে প্রধান বাধা। তার উপলব্ধি হয়, শুধু নিজেকে নয় বরং সব নারীদের নিয়ে মর্যাদার সাথে বাঁচতে হবে। তাই প্রশিক্ষণ শেষে নারীর মর্যাদাহীন ও অমর্যাদাকর জীবনের মূল কারণ দূর করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। অব্যাহত রাখেন বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ। তিনি স্থানীয় নারীদের আমন্ত্রণ জানান 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণ' ও 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার। তার আহ্বানে অনেকেই উপরোক্ত দুটি প্রশিক্ষণ

গ্রহণ করেন। এছাড়া লক্ষ্মী সরকার তার ইউনিয়নের নারী-পুরুষদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'শুয়াগ্রাম পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি'। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় পাঁচ শ' জন। এছাড়া লক্ষ্মী সরকার যুক্ত হন বিভিন্ন সংগঠনের সাথে। লক্ষ্মী সরকার ১৯৯৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত তিনি শুয়াগ্রাম ইউনাইটেট ক্রেডিট ইউনিয়ন (SUCU)-এর ডিরেক্টর বোর্ড ও বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি গোপালগঞ্জ জেলা বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯৯ সনে স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মহাসমাবেশে (জাতীয় সংসদের সামনে মানিক মিঞা এভিনিউতে) প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঢাকা বিভাগের ১৬টি জেলার পক্ষ থেকে তিনি বক্তব্য রাখার সুযোগ পান। ১৯৯৯ সালে লক্ষ্মী সরকার দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক ও নির্বাচিত ইউপি সদস্য হিসেবে স্থানীয় সরকারের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ২০০০ সালে একই উদ্দেশ্যে ভারতে গমন করেন।

জনপ্রতিনিধি হিসেবে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে লক্ষ্মী সরকার ২০০২ সালে পুনরায় শুয়াগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হন এবং জয়লাভ করেন। এরমধ্যে কিছু সময় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

নিজেকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া এবং স্বামী ও এলাকার লোকজনের অনুপ্রেরণায় লক্ষ্মী সরকার ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে (কোটালীপাড়া থেকে) প্রার্থী হন। কিন্তু অল্প ৪৫৭৪২ ভোট পান এবং মাত্র ২২২৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। পরাজিত হওয়ায় তার মাঝে কিছু সময়ের জন্য নেমে আসে হতাশা। এমনকি ভবিষ্যতে আর নির্বাচন করবেন না– মনে মনে এমন সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেন তিনি। কিন্তু ২০১৪ সালে চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর পুনরায় জনগণ তাকে প্রার্থী হওয়ার জন্য উৎসাহ যোগায়। তাদের উৎসাহে তিনি প্রার্থী না হয়ে পারেননি। জনগণও তাকে নিরাশ করেনি। ৪৯,৫০০ ভোট পেয়ে (৫১.২৫% ভোট) নির্বাচিত হন লক্ষ্মী সরকার। নির্বাচনে তাকে বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে হয়নি। কারণ পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি জনগণই নিজেদের উদ্যোগের ছাপানো ও বিতরণের ব্যবস্থা করে দেয়।

নির্বাচিত হওয়ার পর তার সেই ছোটবেলার স্বপ্ন রাজনীতি করে মানুষের সেবা করার ইচ্ছে পূরণ হয়। জনগণের সেবা করার জন্য পান বড় পরিসর, বড় দায়িত্ব। আর সে দায়িত্ব সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথেই পালন করে যাচ্ছেন লক্ষ্মী সরকার। উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন, সড়ক, মসজিদ, মন্দির নির্মাণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এর পাশাপাশি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ যেমন, যৌতুকমুক্ত বিবাহ সংঘটন ও হিন্দু নারীদের বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত, শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানো, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা ও শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে সচেষ্ট রয়েছেন তিনি। ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ইতোমধ্যে লক্ষ্মী সরকার ২০টি পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ, প্রায় ১৫টি বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং প্রায় দশটি যৌতুক ছাড়া বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেন। সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বয়স্ক শিক্ষা দিয়েছেন অনেককে, যার মধ্যে তার মা-ও রয়েছেন।

খুলনার নারীনেত্রীদের পক্ষ থেকে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনে (রাজধানী ঢাকায় ২০১৪ সাল) দেয়া লক্ষ্মী সরকার-এর বক্তব্যটি ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক। তিনি ওই বক্তৃতায় বলেন, 'আমি নিজে একজন নারীনেত্রী হওয়ার কারণে সামান্য একজন গৃহবধূ হয়েও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হতে পেরেছি। আমার মত খুলনা অঞ্চলে আরও দু জন নারীনেত্রী জনগণের সরাসরি ভোটে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া এ অঞ্চলের প্রায় তিন শ' জন নারীনেত্রী বিভিন্ন উচ্চপদে বসে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন।'

লক্ষ্মী সরকার যেতে চান আরও বহুদূর। ভবিষ্যতে মহান জাতীয় সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত মহিলা আসনে) হয়ে পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে এগিয়ে নিয়ে আসতে চান এবং গরীব, দুঃখী ও শ্রমজীবী মানুষের পাশে থাকতে চান। তিনি এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখেন, যেখানে নিশ্চিত হবে নারী-পুরুষের সমতা। নারীরা হবে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী। নিশ্চিত হবে নারীর ক্ষমতায়ন। কারণ লক্ষ্মী সরকার বিশ্বাস করেন, নারীর ক্ষমতায়ন মানেই জাতির তথা মানবতার উন্নয়ন।

শৈশবের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিবেদিত আত্মপ্রত্যয়ী শামীম আরা খাতুন

হেলাল উদ্দিন ও আসাদুল ইসলাম

একটা সময় ছিল যখন সন্তান উৎপাদন এবং ঘরের ত্রিকোণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল নারীর জীবন। কিন্তু কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন আন্দোলনের ফলস্বরূপ পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে শুরু করে। প্রসার ঘটে নারী শিক্ষার। ক্রমান্বয়ে তারা ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় অনেক নারীই সব প্রতিকূলতা এড়িয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং একইসঙ্গে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। এমনই একজন আত্মপ্রত্যয়ী নারী ও জনপ্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শামীম আরা খাতুন।

যিনি শৈশবকাল থেকেই নিজেকে ভাল কাজের সাথে, সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতেন, তিনি কি পারেন ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে? আর তাই ঘরের ত্রি-সীমানা পেরিয়ে নারীদের সংগঠিত করা এবং নারীদের ভাগ্যের পরিবর্তন করার শৈশবের সেই লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছেন শামীম আরা। সমাজে যৌতুক বিরোধী সভা পরিচালনা, শিশুবিবাহ বন্ধে অভিভাবকদের সচেতন করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তোলাসহ সমাজ উন্নয়নের নানা কাজে সদা নিবেদিত এই জনপ্রতিনিধি।

১৯৬১ সালে ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ড উপজেলার তাহিরহুদা ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শামীম আরা খাতুন। বাবা আব্দুর রহমান, যিনি পাকিস্তান আমলে সেনাবাহিনীতে চাকুরি করতেন। পরে চাকুরি ছেড়ে পরিবারসহ পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে আসেন। ১৯৭১ সালে শুরু হয় বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রাম। শামীম আরার বাবা মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি যশোর জুট মিলে নিরাপত্তা কর্মকর্তা (সিকিউরিটি অফিসার) হিসেবে চাকুরি করতেন।

শামীম আরার মা আবেদা খাতুন একজন গৃহিণী। তাদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা চার জন। পারিবারিকভাবেই লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় শামীম আরার (পাকিস্তানে থাকা অবস্থায়)। এরপর ১৯৭৫ সালে নিজ গ্রামে অবস্থিত শ্রীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন তিনি। ১৯৮৩ সালে শামীম আরা দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি এবং ১৯৮৫ পাশে এইচএসসি পাশ করেন। সাংসারিক ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যান। ২০০৬ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে বিএ পাশ করেন।

লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি গান গাইতে পছন্দ করতেন। এছাড়া তিনি আশেপাশের কোনো নারীকে নির্যাতনের শিকার হতে দেখলে যথাসম্ভব তার পাশে দাঁড়াতেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়ার চেষ্টা করতেন।

১৯৭৭ সালে স্থানীয় যুবক মোঃ মতিয়ার রহমানের সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তার দেবর ও ননদ সবাই ছিলেন সুশিক্ষায় শিক্ষিত। শশুরবাড়ির লোকজন প্রায় সবাই শামীম আরাকে খুব পছন্দ করতো। এভাবেই কেটে যেতে থাকে তার জীবন। ২০১০ সালের শুরুতে শামীম আরা স্থানীয় কিন্ডার গার্টেন-এ শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন। তবে শিক্ষকতার পাশাপাশি সমাজ সচেতনতামূলক কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হন, যোগ দেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে।

২০০৫ সালে উন্নয়নকর্মী আব্দুস সবুর-এর আমন্ত্রণে শামীম আরা বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তার চিন্তার জগতে ব্যাপক

পরিবর্তন আসে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তিনি জানতে পারেন, সমাজে নারীদের অবস্থা, অবস্থান ও নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণ এবং এর থেকে প্রতিকারের উপায়। তিনি শিখেন– প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা লুকায়িত থাকে। তাই প্রশিক্ষণে থাকা অবস্থায়ই তিনি তার নিজের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সিদ্ধান্ত নেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, শামীম আরা একটি স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণের সময়ই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, শুধু আত্মন্নোয়ন কিংবা ঘর-সংসার নিয়েই নারীর জীবন নয়। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্যও সাধ্যমত কাজ করা দরকার। এমন সিদ্ধান্ত থেকে এবং স্থানীয় নারীনেত্রী ও পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে তার স্বামীর অনুপ্রেরণায় তিনি ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমর্থনে এবং জনগণের ভালবাসায় তিনি ১ লাখ ৩২ হাজার ১১৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী পান মাত্র ২৮ হাজার ৯২৩ ভোট।

বিপুল ভোটে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর শামীম আরার দায়িত্ব বেড়ে যায়। একদিকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব, আরেকদিকে জনগণের চাহিদা পূরণ এবং অন্যদিকে ঘর-সংসার সামলানো। কিন্তু কথায় আছে না– 'যে নারী রাঁধতে জানে, সে নারী সবকিছু পারে'। এ কথার সাথে মিল রেখে শামীম আরা সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে একইসাথে সবগুলো দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

তিনি নির্বাচিত হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ থেকে জেনেছেন যে, বাল্যবিবাহ কন্যাশিশু তথা নারীদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা। কারণ এটি কেড়ে নেয় কন্যাশিশুদের বেড়ে ওঠার স্বপ্ন, বঞ্চিত করে শিক্ষা ও পুষ্টির অধিকার থেকে। তাই বাল্যবিবাহ বন্ধে শামীম আরা সচেষ্ট হন। ইতোমধ্যে তিনি ১২টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া শামীম আরা আটটি পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ এবং ছয়টি যৌতুক ছাড়া বিবাহ আয়োজনে পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয় নারীদের, বিশেষ করে স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের হস্তশিল্প কাজ শেখানোর ক্ষেত্রেও তিনি ভূমিকা পালন করেন।

শামীম আরা খাতুনের ইচ্ছা– তার এলাকার নারীদের বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, তাদেরকে সংগঠিত করে নারী নির্যাতন বন্ধ করা। সর্বোপরি নারীদের জন্য সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

লাইলা আরজুমান বানুঃ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নিবেদিত এক নারী

হেলাল উদ্দিন

প্রতিদিন সকালেই বাড়ির সামনে অসংখ্য মানুষের ভিড় আর কোলাহল। কারও পারিবারিক সমস্যা, কারও একান্তই নিজের, আবার কারো আর্থিক সাহায্য এবং পরামর্শ দরকার। এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপস্থিতি এ বাড়ির মানুষের কাছে অতি পরিচিত একটি বিষয়। প্রথম দিকে বাড়ির সদস্যরা কিছুটা বিরক্ত বোধ করলেও এখন সকলেই বিষয়টির সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন। যার জন্য বাড়ির সামনে এত মানুষের আগমন আর কোলাহল তিনি হলেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ লাইলা আরজুমান বানু। গাংনী উপজেলা সদর থেকে আট কিলোমিটার দূরের ষোলটাকা ইউনিয়নের চিত্র এটি। এই চিত্র আমাদের মনে এক ধরনের সুখস্মৃতির জন্ম দেয়। কারণ মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও এ দৃশ্য ছিল বিরল। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। ফলে নারীদের এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে দেশও এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

ষোলটাকা ইউনিয়নেই রহিম বক্স মন্ডল ও আনোয়ারা বেগম দম্পতির বসবাস। আর্থিকভাবে সচ্ছল এই দম্পতির চার কন্যা সন্তান। পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তানটির নাম লাইলা আরজুমান বানু। সাধারণত পরিবারের ছোট সন্তান একটু আদরেই বড় হয়। বানুর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। বরং বাবা মায়ের বেশি আদরের কারণে তার শৈশব কেটেছে চঞ্চলতায় আর দূরন্তপনায়। লেখাপড়া, খেলাধুলায় আর দুষ্টমিতেই দিন কেটে যেত বানুর। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় দৌড় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কারণে বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ হয়েছে অনেকবার।

রহিম বক্স মন্ডল তার চার কন্যাকে উচ্চশিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন পূরণের জন্য তিনি সকলের লেখাপড়ার দিকে কড়া নজর রাখতেন, কিন্তু হঠাৎ করেই বড় কন্যা এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তিনি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং ছোট মেয়ে বানুর লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। পরিবারের এমন হটকারী সিদ্ধান্তের কারণে বানুর জীবন থেকে মূল্যবান দুটি বছর হারিয়ে যায়। কিন্তু বাবার অজান্তে গোপনে লেখাপড়া করে বানু। স্কুলের নাম জোড়পুকুরীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৮৩ সালে এসএসসি পাশ করেন। তার এক বন্ধুর সহযোগিতা এবং নিজের প্রবল আগ্রহের কারণে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করেন বানু। পূরণ হয় তার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন।

এসএসসি পাশের পর বাবা রহিম বক্স মন্ডল পুনরায় মেয়ের লেখাপড়ার প্রতি নজর দেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরই ঘটে বানুর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি একই গ্রামের স্নাতক (অনার্স) অধ্যয়নরত ওয়ালিউল আজম-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তারা উভয় পরিবারের অমতে পালিয়ে বিয়ে করেন, যা দু পরিবারের কেউও মেনে নেয়নি। ফলে তিন মাস নব দম্পতিকে এক রকম পালিয়ে থাকতে হয়। তিন মাস পর এলাকার বাসিন্দা ও নিকট আত্মীয়দের সহযোগিতায় বানু শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতে পারলেও প্রথম থেকেই শুরু হয় আলাদা সংসার। স্বামী-স্ত্রী দুজনে লেখাপড়া করার কারণে চরম আর্থিক সংকটে পড়তে হয় তাদের। তবে দুর্বিষহ এই জীবন তাদের বেশিদিন থাকেনি। ১৯৮৪ সালে চাকুরি পান স্বামী। স্বামীর চাকুরি আর শ্বশুরের দেওয়া সামান্য জমি দিয়ে বেশ ভালভাবেই কেটে যেতে থাকে তাদের সংসার। এভাবে প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়ে স্বাভাবিক দিন-যাপন করতে হয় বানুদের। এর কিছুকাল পর স্বামীর একটি প্রতিষ্ঠানে বানুরও চাকুরি হয়। তাদের দুর্দিনে ছোট দেবর সেলিম আহাদ মুনু সর্বদাই পাশে তাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন।

কথায় আছে– সুসময়ে বন্ধু সবাই, অসময়ে কেউ কারো নয় – বানুর জীবনেও এই প্রবাদের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয়নি। দুঃখের সময়ে কেউ পাশে না থাকলেও চাকুরি পাওয়ার পর সকলে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা চায় তার কাছে।

২০০৫ সালে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন বানু। প্রশিক্ষণের পর নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে তার গতি বৃদ্ধি পায়। নারীদের আত্মনির্ভশীল ও তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ

শুরু করেন বানু। নারীদের আত্মনির্ভরশীল ও তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'ষোলটাকা নারী উন্নয়ন সংস্থা' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা মাসিক ১০০ টাকা করে সঞ্চয় জমা করে। সঞ্চিত অর্থ নিজেদের মধ্যে ঋণ হিসেবে স্বল্প সুদে বিতরণ করা হয়। বর্তমানে তাদের মুলধন অনেক বেশি। সমিতির সদস্যরা নকশী কাঁথা, বেতের কাজ, কাপড় সেলাই, মৎস্য চাষ ও ব্যবসা ইত্যাদি করে তাদের জীবনের অনেক উন্নয়ন সাধন করেন।

২০০৬ সালে লাইলা আরজুমান বানু গাংনীর উজ্জীবক সৈয়দ জাকির হোসেন-এর কাছে জানতে পারেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণের কথা। বিষয়টি বানুকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি উজ্জীবক প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণের অপেক্ষায় থাকেন। ২০০৬ সালে বানু উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১,১৫৭তম ব্যাচে) অংশগ্রহণ করেন বানু। প্রশিক্ষণের পর এক ধরনের নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি হয় বানুর মধ্যে। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন প্রভৃতি বিষয়ে কাজ শুরু করেন বানু।

লাইলা আরজুমান বানু বলেন, 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। আমার পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এই সকল বিষয়গুলোর সঙ্গে মানিয়ে দিয়ে এখন আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল মেহেরপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক। দল থেকে সমর্থন নিয়ে গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেই আমি। এক্ষেত্রে আমাকে অনুপ্রাণিত করেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মোঃ সিরাজুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন এমপি এবং সমাজের সকল স্তরের জনসাধারণ। আমার নির্বাচনী এলাকায় ভোটার সংখ্যা দুই লাখ আট হাজার। নির্বাচনে আমি ১৮,৭০০ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হই।'

নির্বাচিত হওয়ার পর লাইলা আরজুমান বানু নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা ও নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারে কাজ করে চলেছেন এবং পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, তালাক ও যৌতুক বন্ধে তিনি ভূমিকা রেখে চলেছেন। বিভিন্ন সময় তিনি পাশে দাঁড়িয়েছেন নির্যাতিত নারী ও অসহায় মানুষের পাশে।

লাইলা আরজুমান বানুর মনে করেন, পদমর্যাদার কারণে তার রয়েছে অসহায় মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এবং আত্মশক্তি আর মনোবল দিয়ে লড়াই করে নিজে বাঁচবেন এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন।

পাংশার সাহিদা আহম্মেদঃ অপরাজেয় এক জনপ্রতিনিধি

শেখ আব্দুল খালেক

যাদের ব্যক্তিগত ত্যাগ ও মহান কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়ে যায়, কিছু পাওয়ার আশা না করেই যারা নানা প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে চারপাশকে বদলে দেয়ার প্রাণান্তকর প্রয়াসে নিজেদের ব্রত রাখেন, এমনই একজন নির্ভীক কর্মী ও নন্দিত জনপ্রতিনিধি, রাজবাড়ির পাংশা উপজেলা পরিষদের দু বার নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা আহম্মেদ। জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যিনি সমাজ উন্নয়নমূলক নানান কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তোলার কাজে সদা নিবেদিত রয়েছেন।

পাংশা উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের চরঝিকরী গ্রাম, বলতে গেলে অজপাড়াগাঁ। এ গাঁয়েই ১৯৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন সাহিদা। বাবা গওহর উদ্দিন, যাকে সবাই গহের সাহেব বলে ডাকতেন। তখনকার দিনে সেই ব্রিটিশ আমলে কোলকাতা থেকে আইএ পাশ করেন সাহিদার বাবা। শিক্ষাজীবন শেষে চাকুরিতে যোগদান করেন তিনি। ছেলে চাকুরি করুক– এটা চাইতেন না শাহিদা দাদা। তাই চাকুরি ছেড়ে দিয়ে পাংশাতে ব্যবসা শুরু করেন সাহিদার বাবা। চন্দনা নদীর তীরে মনোরম পরিবেশে পাটের বড় গোডাউন ছিল তার বাবার।

শাহিদা যখন ছোট তখন তার বাবা পরিবার নিয়ে পাংশা উপজেলা সদরে চলে আসেন। শাহিদার লেখাপড়া শুরু হয় বাঁশ আরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মা ছিলেন গৃহিণী, যিনি সদা-সর্বদা আদর, স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে সন্তানদের মানুষ করার প্রতি সচেতন ছিলেন; যে কারণে শাহিদার সব ভাই-বোনরাই শিক্ষিত হয় এবং বর্তমানে সরকারি চাকুরি করেন।

শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব শেষ করে শাহিদা ভর্তি হন পাংশা জজ উচ্চ বিদ্যালয়ে। সময়ের ধারাবাহিকতায় পাংশা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন তিনি। বিএ ক্লাসে ৮০ জন ছেলের বীপরীতে তিনিই ছিলেন একমাত্র মেয়ে। তাই নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। শিক্ষাজীবন শেষ করে শাহিদা স্থানীয় পাংশা গালর্স স্কুলে কিছুদিন চাকুরি করেন। তার দু মেয়ে ও এক ছেলে। বড় মেয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাশ করে। কিছুদিন চাকুরি করলেও বর্তমানে গৃহিণী। ছোট মেয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগ থেকে পাশ করে ওরিয়ন কোম্পানির প্রভাক্ট এক্সজিকিউটিভ হিসেবে কর্মরত। একমাত্র ছেলে বরিশাল মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। শাহিদার স্বামী নাজিম উদ্দিন আহম্মেদ মৎস কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরি শুরু করেন, যিনি সর্বশেষ এ বিভাগের উপ-পরিচালক পদে থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শাহিদা কলেজে পড়া অবস্থা থেকেই ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। বাম রাজনীতির সাথে জড়িত তার স্বামী তাকে রাজনীতি করার ক্ষেত্রে সবসময় উৎসাহ ও সাহস জোগাতেন। ঐতিহ্যগতভাবে শাহিদার পরিবারও একটি রাজনৈতিক পরিবার। তার বাবা ব্যবসার পাশাপাশি রাজনীতি করতেন। তার দাদা ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন (তখন ইউনিয়ন পরিষদের প্রধানকে প্রেসিডেন্ট বলা হতো)। শাহিদার বাবা পাংশা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

স্থানীয় নারীনেত্রী কাকলী আপার আহ্বানে শাহিদা আহম্মেদ দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে ২০০৪ সালে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৬ সালে তিনি বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্সে (২০০২ ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ দুটি থেকে তিনি জানতে পারেন, মানুষ নেতা হয়ে জন্মায় না, কর্মের মধ্য দিয়েই তাকে নেতা হিসেবে গড়ে ওঠতে হয়। তিনি আরও জানতে পারেন, 'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি' এবং নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষদের তথা সমাজকেও লাভবান করে। এমন অনুধাবনের তিনি বড় পরিসরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রত নেন, যার উদ্দেশ্য হলো– জনগণের সেবা করা এবং অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

শাহিদা ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আম প্রতীক নিয়ে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে (পাংশা থেকে) প্রার্থী হন। রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হওয়ায় নির্বাচনে প্রার্থী হতে তাকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু শুনতে হয়েছে অনেক কটুকথা। তিনি যখন ভোট চাইতে যান, তখন অনেকেই বলেন, মেয়েরা হবে চেয়ারম্যান? জাত-ধর্ম সবই যাবে – এ রকম আরও অনেক কথা। কিন্তু নির্বাচনে ১০,৪৭,১৮৫ ভোটে (মোট ভোটের ৬৬.৫৮%) তিনি নির্বাচিত হয়ে প্রমাণ করেছেন– মেয়েরাও চাইলে পারে।

নির্বাচিত হওয়ার পর শাহিদা ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে সদা নিয়োজিত থাকেন। যার ফলস্বরূপ ২০১৪ সালে ৪৫ হাজার ৬৯০ ভোট পেয়ে তিনি পুনরায় পাংশা উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হন তিনি।

বর্তমানে শাহিদা পাংশার নারীদের ভাগ্যন্নোয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যেমন, মৎস চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, বুটিকের কাজ ও শাড়িতে নকশার কাজ ইত্যাদি আয়োজন করে চলেছেন। এছাড়া সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজ যেমন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বন্ধ এবং শিশুদের বিদ্যালয়গামীকরণে জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও নির্যাতনের শিকার হওয়া শিশু ও নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান করছেন তিনি।

শাহিদা মনে করেন, নারীরা অবলা নয়। তারাও পারে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে। তবে নিজেদের অধিকার নিজেদেরকেই অর্জন করে নিতে হবে। তাহলেই নারী জাতির উন্নতি হবে। তিনি আরও মনে করেন, সেদিন বেশি দূরে নয়, যে দিন নারীরা নিজেরাই গড়বে গৌরবময় জীবন এবং সমৃদ্ধ জাতি।

নিরক্ষর ও বাল্যবিবাহমুক্ত উপজেলা গড়তে চান হেলেনাজ তাহেরা

মাইনুল ইসলাম

শীত যায় যায়, বসন্তের আগমনি বার্তা। সমুদ্রের হাওয়া যেন প্রকৃতির অনাবিল সুখ বয়ে দিল ক্লান্ত সিক্ত মনে। মানবসেবায় নিবেদিত থাকা এক নারীর অপেক্ষায় বসে রইলাম এক মুদি দোকানের সামনে থাকা আসনে। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল, কক্সবাজার শহরের চাউলবাজার ফুলবাগ সড়কের চিপা গলির ডানপাশে আকাশি রঙের পাঁচতলা বাড়িতে উঠতে তিনতলায় আপার সাথে দেখা। তিনি পাঁচতলার ডান পাশে তার নির্দিষ্ট কক্ষে আমাকে বসালেন। চিরাচরিত কৌশল বিনিময় শেষে আপার সাথে আলাপ।

হঠাৎ আপার মোবাইল বেজে উঠল। তিনি মোবাইল ধরে বললেন– আমি কিছুক্ষণ পর আসলে হবে না, আমার ঘরে মেহমান এসেছে। মোবাইলে কথা বলা শেষ করার পর আপা আমাকে জানান, একটি গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য উনাকে ডাকা হচ্ছে। উনার কথা শেষ হওয়ার পর আমি বললাম– আপা এত বড় উপজেলার জনগণের সেবার পাশাপাশি আপনি এতকিছু কীভাবে করতে পারেন? উত্তর তিনি বললেন– সমাজের অসহায়, গরিব ও দুস্থ নারীদের সেবা করার জন্য আমি চিরকাল ছিলাম, এখনো আছি।

আপার কক্ষটির মধ্যে তেমন কিছুই নেই, আছে শুধু একটি শো-কেস। শো-কেসের নিচে রয়েছে এলাকার গরিব গর্ভবতী নারীদের নিরাপদ প্রসব করানোর কিটবক্স। পরে জানতে পারলাম একজন ধাত্রীর কাজও করে থাকেন তিনি। অনেক বছর ধরে বহু মায়ের সন্তান প্রসব করিয়ে সকলের নিকট তিনি পরিচিত। জীবন সংগ্রামে জয়ী, অসহায় মানুষের আশ্রয়স্থল এই নারীর নাম হেলেনাজ তাহেরা, যিনি বর্তমানে কক্সবাজার সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান।

কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের বেশিরভাগ এলাকাই সমুদ্রের পাড় ঘেরা। অনেকটা চারদিকে সমুদ্র, আর মাঝখানে এ ইউনিয়ন। উন্নয়নের সে রকম ছোঁয়া এখানে। লেখাপড়ার জন্য স্কুল গড়ে উঠলেও অসচেতনতার কারণে অনেক ছেলে-মেয়েই এখনো শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। নিরক্ষরতা দূরীকরণে তেমন কোনো ভূমিকা নেয়নি সচেতন মহল। বেশিরভাগ মানুষই বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিচে। ১৯৭৭ সালে ৩০ শে জানুয়ারি এই ইউনিয়নেরই মাইজপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হেলেনাজ তাহেরা। বাবার নাম হাজী মৌলানা মোহাম্মদ আকতার হোসেন, মায়ের নাম ফুল জুবাইদা খানম। সংসারে বাবা-মা ছাড়া তারা দু বোন এবং পাঁচ ভাই। ১৯৯১ এর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে তাহেরার পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে চার ভাই-ই মারা যান।

তাহেরার জীবনের কখনো টাকা-পয়সার অভাব ছিল না। ছিল শুধু সামাজিক ও পরিবারিক বাধা। তার মত মেয়েরা যখন সে বাধা উপেক্ষা করেও সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতো, তখন তাদের শুনতে হতো নানান নেতিবাচক কথা। স্বয়ং তাহেরা আপার দাদা ও মা বলতেন– 'যেভাবে পুরুষের মতো চলাফেরা করিস, তোকে পালকি ভরে নিলে, ওইজ্যা ভরে এনে দিবে। কার ভরে নিলে রিকসা ভরে পাঠাই দিবে।' এত কথা শোনার পরও তিনি বসে থাকার পাত্রী ছিলেন না। কারণ জীবনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য ছিল অবিচল, ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। গ্রামের অসহায় মানুষের সেবায় নিবেদিত এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন বলে সবসময় মার বকা শুনতে হতো, অনেকটা এরকম– 'তুই কি মেম্বার না চেয়ারম্যান যে মানুষের বাদাম্যাগিরি করিস?" আরও বলতো– 'ঘরের খেয়ে বুনের মোষ চড়াষ।'

শিক্ষাজীবনের শুরুতে ছিলেন তাহেরা ছিলেন খুব চঞ্চলমনা ও একটু মেজাজী। জেদ ছিল– প্রত্যেক শ্রেণিতেই ক্লাসের ক্যাপ্টেন হওয়া চাই। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তাহেরা ভর্তি হন পার্শ্ববর্তী মাতারবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। লেখাপড়াতে ভালই ছিলেন তিনি। এর পাশাপাশি খেলাধুলা, গান-বাজনা, মোটকথা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখান তিনি। এর ফলস্বরূপ অনেক পুরস্কারও অর্জন করেন তিনি।

তাহেরা তখন মাত্র দশম শ্রেণির ছাত্রী। সে সময় কক্সবাজার সদরে এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে আসলে সাতকানিয়ার ব্যবসায়ী আবুল হাশেমের ভাল লেগে যায় হেলেনাজকে। তারপর দেয়া হয় বিয়ের প্রস্তাব। মা-বাবা মেয়ের চঞ্চলতা দেখে মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে বিয়েতে রাজী হয়ে যান। কিন্তু তাহেরার শর্ত ছিল তাকে যৌতুকবিহীন বিয়ে দিতে হবে। অবশেষে সকল শর্তসাপেক্ষে স্বামী রাজী হওয়ায় ১৯৯২ সালে হেলেনাজ তাহেরার বিয়ে হয়ে যায়। শ্বশুরের বড় পরিবার। শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর সংসারে ভালই কাটছিল তার জীবন। কিন্তু বাড়ির অন্যান্য বউদের যৌতুক দিয়ে নিয়ে এনেছেন বলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাহেরাকে নানাভাবে কটু কথা বলত। এসব কথা সয়ে তাহেরা মায়া-মমতা আর ভালবাসা দিয়ে শ্বশুরবাড়ির সবার মন জয় করে নেন অল্প দিনের মধ্যেই।

বিয়ের এক বছর পর ১৯৯৩ সালে প্রথম সন্তানের জননী হন তাহেরা। ফুটফুটে কন্যা সন্তান যেন তাহেরার ঘর আলো করে দেয়। এরপর তাহেরা কোলে আসে আরও একটি কন্যা ও ছেলে সন্তান। বর্তমানে বড় মেয়ে স্নাতক (সম্মান) পাস, দ্বিতীয় মেয়ে এইচএসচি পাশ করে স্নাতক (অনার্স) পড়ছে, আর একমাত্র ছেলে এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

মানবসেবার প্রতি তাহেরা আপার আগ্রহ জন্মায় ১৯৯১ এর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের সময় থেকে। সে ভয়ঙ্কর ও হৃদয়বিদারক ঘূর্ণিঝড়ে দ্বীপ ইউনিয়ন মাতারবাড়ীর সর্বহারা জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য স্বেচ্ছাব্রতী হিসেবে রেড় ক্রিসেন্ট বাংলাদেশে যোগ দেন তিনি। এখনো রেড় ক্রিসেন্ট বাংলাদেশ-এর আজীবন সদস্য হিসেবে আছেন হেলেনাজ তাহেরা। সে সময় কক্সবাজার শহরের চাউলবাজার ফুলবাগ এলাকায় গরিব-দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি গর্ভবতী নারীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ও মাতৃত্বকালীন সেবা প্রদান এবং নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে সোচ্চার থাকেন তিনি। তাই ২০০২ সালে জনগণের বিশেষ অনুরোধ ও অনুপ্রেরণায় কক্সবাজার পৌরসভার নারী কাউন্সিলর প্রার্থী হন হেলেনাজ তাহেরা। জনগণের ভালবাসায় সে নির্বাচনে জয়লাভও করেন তিনি। ২০০২ সালে ১৫ দিনের জন্য বাংলাদেশের প্রথম নারী প্যানেল মেয়র নির্বাচিত হন। এই অল্প দিনে তিনি পৌরসভায় বিভিন্ন কাজে ৩০ শতাংশ নারী শ্রমিক সম্পৃক্তকরণ ও পৌরসভার ১২টি ওয়ার্ডে সাতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন।

২০০৩ সালে হেলেনাজ তাহেরা তার স্বামীর অনুপ্রেরণায় চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত নারী কাউন্সিলর হিসেবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৬ সালে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্সে প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণ করেন তিনি। তাহেরা বলেন, 'প্রশিক্ষণ নেয়ার পর আমার চিন্তা-চেতনার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। আমি বুঝতে পারি, শুধু গুটি কয়েক মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন করলে হবে না, আমাকে সমগ্র বিপুল সংখ্যক মানুষের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সেজন্য প্রয়োজন নিজেকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া।' তাই এবার স্বামী ও দীর্ঘদিনের চলার সাথীদের অনুপ্রেরণায় ২০১৪ সালে কক্সবাজার সদর উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে জনগণের মনোনীত সর্বদলীয় মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে প্রার্থী হন তিনি এবং ৭৩,৩৮৪ ভোটে জয়লাভ করেন।

নির্বাচনে জয়লাভের পর তাহেরা আপার মাথায় চিন্তা এলো সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্যও সাধ্যমত কাজ করা প্রয়োজন। এমন অনুধাবন থেকে তিনি এলাকার অবহেলিত নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি এলাকার বিভিন্ন সড়ক নির্মাণ, পানি নিষ্কাশনের জন্য খাল খনন, কালভার্ট নির্মাণ এবং ফসল উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্র চাষীদের ঋণদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে নির্যাতিত নারীদের আইনি সহায়তা এবং অসহায় নারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন। সমাজ উন্নয়নমূলক নানা কাজে তাহেরাকে সহযোগিতা করছেন তার স্বামী, বিশেষ করে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর নারীনেত্রীরা।

যৌতুক দিতে না পারার কারণে গ্রামের যেসব অসচ্ছল পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছিল না এরকম প্রায় ২৫ জন নারীকে তাহেরা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজ শিখিয়েছেন। পরবর্তীতে দক্ষতার কারণে যৌতুক ছাড়াই এসব নারীদের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এসব কাজের কারণে তিনি অন্য নারীদের জন্য হয়ে উঠেছেন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

একজন নারীনেত্রী হিসেবে ইতোমধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে তাহেরা ২০ জনেরও অধিক শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ৩০ জন শিশুকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ২১৭ জন গর্ভবতী নারীর মাতৃত্বকালীন সেবা প্রদানের জন্য কাজ করেছেন। পাশাপাশি যৌতুক প্রতিরোধেও কাজ করছেন তাহেরা। এছাড়া স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ, নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তুলছেন তিনি। বিশেষ করে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পাক্ষিক উঠান বৈঠক করে নারীদের মাঝে আশার আলো প্রজ্জলিত করছেন হেলেনাজ তাহেরা।

হেলেনাজ তাহেরা তা মহৎ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৮ সালে সফল নারী পুরস্কার, ২০০৭ সালে সফল প্যানেল মেয়র পুরস্কার, ২০১১ সালে প্রান্তিক পুরস্কার, ২০১২ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার এবং ২০১৪ সালে জ্ঞানতাপস ও সাদা মনের মানুষ পুরস্কার লাভ করেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চাইলে তাহের আপা জানান, তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে আরও ত্বরান্বিত করতে চান। তিনি কক্সবাজার সদর উপজেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ও বাল্যবিবাহমুক্ত হিসেবে গড়তে তুলতে চান। এছাড়া বয়স্ক বাবা-মায়েদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলারও স্বপ্ন দেখেন তাহেরা। সর্বোপরি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নারী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ তিনি।

হেলেনাজ তাহেরা বিশ্বাস করেন, হিংসা ও বৈষম্য প্রতিবন্ধকতা আনে, কিন্তু ভালবাসা আনে সমাজে শান্তিময় পরিবেশ। তাই উপজেলার জনগণের ভালবাসা নিয়ে এবং তাদের সম্পৃক্ত করেই তিনি সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন।

ফরিদা ইয়াসমিনঃ জীবন সংগ্রামে জয়ী এক জনপ্রতিনিধি

মাইনুল ইসলাম

১৯৬৭ সালের ২৭ শে জুন। এদিন শ্যাম বর্ণের একটি ফুটফুটে মেয়ে জন্মগ্রহণ করে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার বাদুড়তলা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। মেয়ের মুখ দেখেই পরিবারের লোকজন ভেবেছিল যে, মেয়েটি খুবই লজ্জাবতী হবে। কিন্তু হলো বিপরীত। জন্মের কিছুদিনের মধ্যে মেয়ের উচ্চস্বরে কান্না দেখে সবার ভাবনার পরিবর্তন হল। হাটতে জানা ও কথা বলতে পারার পর মেয়ের অহেতুক বায়না ধরা, বাবা-মায়ের সাথে রাগ করে কথা না বলা! সব মিলিয়ে মেয়ের আচার-ব্যবহার দেখে বাবা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব নেচার আহম্মদ বলেছিলেন, 'তোমরা দেখ এই মেয়ে বংশের বাজ হবে, হবে বজ্রকণ্ঠী এক নারী। সকল বাধা বিপত্তি দূর করে জীবনের সকল সংগ্রামে জয়ী হয়ে জয়মাল্য গলায় পরবে, নিজেকে বিলিয়ে দেবে মানব সেবায়।'

আস্তে আস্তে মেয়েটি শৈশবের শিশুমতির ব্যবহার ছেড়ে নানান কথার পুষ্প ছড়িয়ে অজানা বিষয়াদি জানতে ইচ্ছে ঘুড়িটা উড়িয়ে দিল জ্ঞানের বিশাল নীলাম্বরে – 'বিশ্ব জুড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র', 'শেখব আমি, লিখব লিপি, খুলতে জ্ঞানের নেত্র'। এই ভাবনায় ১৯৭৪ সালে মাত্র চার বছর বয়সে জীবনের প্রথম স্কুলে পা রাখে মেয়েটি । মেয়েটি যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে তখন ঈর্ষণীয় এক প্রতিভার স্বাক্ষীস্বরূপ অমর একুশে রচনা প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ রচনাকার হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। একইভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলজীবনে খেলাধুলা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পারদর্শী ছিল মেয়েটি। মেয়ের এরকম অসাধারণ কৃতিত্ব দেখে বাবার মনে স্বপ্ন জাগে তাকে ভবিষ্যতে আইন পড়িয়ে ব্যারিস্টার বানাবেন।

দেখতে দেখতে বড় হয়ে যায় মেয়েটি। ১৯৮৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় অর্পনা বিদ্যালয় থেকে। কৈশোরের নানান জল্পনা কল্পনায়-ভাবনায় উদীপ্ত এবং প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্বেলিত মেয়েটি। স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে দৃঢ় মনোবল নিয়ে ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ থেকে পাশ করে এইচএসসি।

পরিবর্তনের রঙধনু যখন তার দেহ-মনকে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে উপযুক্ত করেছে, ঠিক তখনই ১৯৮৬ সালে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার সাবেক সংসদ সদস্য ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরীর ভাইয়ের ছেলে, অপসোর আইল্যান্ড-এর কর্মকর্তা বেদারুল আলম চৌধুরীর সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়।

যে মেয়েটি শিক্ষাজীবন থেকে খেলাধুলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ সবক্ষেত্রেই ছিল এগিয়ে, দলনেত্রীর মুকুটই যখন তার একার, তখনই আরও বড় পরিধির স্বাদ নিতে না দিয়ে সংসার জীবনের আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়। আগেই বলা হয়েছে, মেয়েটির মনে অদম্য সংগ্রামের ইচ্ছা আছে। তাই বিয়ের পর মেয়েটি ভেঙে পড়েনি। স্বামীর সংসারে থেকে ১৯৮৯ সালে কক্সবাজার সরকারি কলেজ থেকে বিএ পাশ করে। শত বাধা সামনে এলেও কোন বাধাই বাধা হয়ে থাকেনি তার সামনে।

মা-বাবার সাত সন্তানের বড় আদরের এই দ্বিতীয় সন্তান ইয়াছমিন। পুরো নাম ফরিদা ইয়াসমিন। সংসারে সময় দেয়ার পাশাপাশিও জীবন পরিপূর্ণ করা যায়– এমন ইচ্ছাশক্তি ধারণ করে নিজেকে মনোবলের তুঙ্গে নিয়ে যান। যুক্ত হন নানামুখী গঠনমূলক কাজের সঙ্গে।

২০০২ সাল ফরিদা ইয়াসমিনের জীবনের এক বিভীষিকাময় বছর। স্বামীর কঠিন রোগ হওয়ায় সংসারে দেখা দেয় অভাব-অনটন। অসুস্থ স্বামীকে দেশের অনেক নামকরা ডাক্তার দেখানো হয়। কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য লাভ না করায় উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় ভারতের মাদ্রাজে। সেখানে চিকিৎসা বাবদ অনেক টাকা ব্যয় বেশি হওয়ায় ইয়াসমিন পড়ে যান অর্থ সংকটে। এরকম সংকটের মুহূর্তেও তিনি ভেঙে পড়েননি। মহান সৃষ্টিকর্তার কৃপায় স্বামী ভারতের মাদ্রাজ থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। আবার শুরু হয় ফরিদা ইয়াসমিন-এর সংগ্রাম। সে সংগ্রামে স্বামী তাকে দেয় অনুপ্রেরণা আর উৎসাহ। পরিবারের হাল ধরেন শক্ত হাতে।

কিন্তু সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে জনসেবার অদম্য ইচ্ছাটি তখনও তার স্বপ্ন ছোঁয়ার বাইরে। এ সময়ই ২০০৬ সালে স্বামীর উৎসাহে কক্সবাজার-এর মুক্তি ভবনের কনফারেন্স কক্ষে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন ফরিদা ইয়াসমিন। এর মধ্য দিয়ে তিনি জানতে পারেন বর্তমান সমাজে নারীর বাস্তব চিত্র। নারীর এই দুরবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে মনে মনে পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকেন ইয়াসমিন। তিনি অনুধাবন করেন, বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নারী উন্নয়নে কাজ করলেও তার বেশিরভাগই হয় অপরিকল্পিতভাবে, যে কারণে সে কাজগুলো থেকে খুব একটা ফলাফল অর্জিত হয় না।

উপরোক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি পেয়ে যান আরেক নতুন দিগন্ত, তথা জনগণের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার কৌশল। কারণ তার নেই কোনো পিছুটান। তিনি জানান, তার মনের সুপ্ত স্বপ্নগুলো আরও মেলে ধরার সুযোগ তৈরি করে প্রশিক্ষণটি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিয়সী নারী ও পুরুষের সান্নিধ্যে থেকে ফরিদা ইয়াসমিন পেয়েছেন উদ্যম, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। এদের কাছ থেকেই ধীরে ধীরে তিনি সার্থকতার সাথে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন নেতৃত্বের সব গুণাবলী।

ফরিদা ইয়াসমিন মা হিসেবে সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নসহ নানামুখী সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। জীবনের চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে প্রশিক্ষণের নয় বছর পর বড় পরিসরে জনপ্রতিনিধিত্ব করার বাসনায় এলাকাবাসীর সমর্থনে এবং নিজের মনোবল আর আত্মবিশ্বাসকে সামনে রেখে ২০০৯ সালে রামু উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হন তিনি। কিন্তু এ যাত্রায় তিনি জয়ের মুকুট পরতে পারেননি।

জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত না হয়েও এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে দিন দিন তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকে। অবশেষে আসে ২০১৪ সাল। এ বছর চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে একই পদে রামু থেকে আবারো প্রার্থী হন তিনি। এবার জনগণ তাকে বিমুখ করেনি। তার নিরলস সমাজকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ বিপুল ভোটে জয়ী হন ইয়াসমিন। জনগণ তাকে পরিয়ে দেয় জয়লাভের বরণমালা। এবার ইয়াসমিন বড় পরিসরে এলাকার নারী-পুরুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান, পুনর্বাসন ও পরিবেশসহ বহুমাত্রিক উন্নয়ন কর্মে তিনি নিজেকে যুক্ত করার সুযোগ পান এবং যুক্ত করেনও।

সংগ্রামী ফরিদা ইয়াসমিন ভাগ্যহীন, অসহায়, স্বামী পরিত্যক্তা, যৌতুকের শিকার ও অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের বিনা পয়সায় আইনি সহায়তা প্রদান করেন। শিশুবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক প্রথা রোধ, আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ, সেই সাথে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে উঠান বৈঠক ও বিভিন্ন প্রচারাভিযান পরিচালনার পাশাপাশি ইউনিয়নের গ্রামগুলোতেও শুরু করেন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি।

সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০-এ জেলার একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ী নারী হিসেবে ফরিদা ইয়াসমিনকে বেগম সুফিয়া কামাল ফেলোশিপ ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

ফরিদা ইয়াসমিন বর্তমানে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম কক্সবাজার জেলা শাখার আহ্বায়ক, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক জেলা শাখার সদস্য। ২০০৫ সালে তিনি রামু উপজেলা বিএনপির মহিলা দলের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি জেলা মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদিকা ও কেন্দ্রীয় মহিলা দলের সদস্য ও রামু উপজেলা পরিষদের আটটি স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং বেগম রাবেয়া মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ব্যক্তি জীবনে ফরিদা ইয়াসমিন চার মেয়ে ও এক ছেলের জননী। বড় মেয়ে বুশরা চৌধুরী খুশবু এলএলবি পাশ করে চট্টগ্রাম জর্জ কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন। মেঝ মেয়ে ফারিয়া চৌধুরী পিয়াল এলএলবি তৃতীয় সেমিস্টারে পড়ছে। সেঝ মেয়ে সামিয়া চৌধুরী এইচএসচি পরীক্ষার্থী। আর ছোট মেয়ে নাদিয়া মুশরাত চৌধুরী সাজিন দশম শ্রেণিতে পড়ে। একমাত্র ছেলে ইফতেখার মুনির চৌধুরী উমায়ের কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। সন্তানদের লেখাপড়া করানোর ক্ষেত্রে তিনি যেন এক সফল বঙ্গজননী।

ফরিদা ইয়াসমিন শ্রম, সাধনা আর আত্মবিশ্বাসের ফলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে আজকের এ পর্যায়ে এসেছেন। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্স প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী হিসেবে গর্ববোধ করেন। তিনি বলেন, এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি আলোকিত পথের সহজ সন্ধান পেয়েছেন। নারীকে পশ্চাৎপদতা থেকে তুলে আনতে এ প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেও তিনি মনে করেন।

ফরিদা ইয়াসমিন রামু উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে সাধারণ আসনে পুরুষের পাশাপাশি নির্বাচন করার জন্য নারীদের সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাতে চান। কারও ওপর নির্ভরশীল না হয়েই নিজের শক্তি আর সামর্থ্য দিয়েই অনগ্রসর নারীদের এগিয়ে নিতে চান, অবহেলিত নারীদের পাশে থেকে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনে শক্তি যোগাতে চান। তিনি মনে করেন, সমাজ থেকে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠা করা গেলে এবং সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান সমাজের উন্নয়নে কাজ করে তবেই গড়ে উঠবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

ফৌজিয়া খানম: দক্ষিণ চট্টলার অগ্নিকন্যা

মাইনুল ইসলাম

বন্দরনগরী চট্টগ্রাম, যা বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে খ্যাত। এ মহানগরীর অনতিদূরেই অবস্থিত উপজেলা রাউজান। এ উপজেলা অনেক বীর সেনানীই অবদান রেখে গেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে। এ উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে পশ্চিম গহিরা গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে ১৯৬৭ সালের ২৬শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্নিকন্যা প্রীতিলতার উত্তরসূরি ফৌজিয়া খানম। পিতা আনোয়ারুল আজিম চৌধুরী ও মাতা শাহাজান বেগম। তাঁদের সাত সন্তানের মধ্যে ফৌজিয়া হলেন সবার বড়।

ফৌজিয়া বাবা-মায়ে প্রথম সন্তান হওয়ায় বাড়তি আদর-স্নেহ পেয়েছেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। নিজেকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করার জন্য শিক্ষাজীবন শুরু করেন মাত্র অল্প বয়সে। ফৌজিয়া বড্ড জেদী ও একগুয়ে স্বভাবের ছিলেন। লেখাপড়া ও খেলাধুলা সর্বক্ষেত্রেই তার প্রথম হওয়া চাই। ব্যাটমিন্টন খেলার প্রতি ফৌজিয়ার ছিল সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পার করে ১৯৮২ সালে কুন্ডেশ্বরী মহাবিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ১৯৮৬ সালে হাটহাজারী কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন তিনি।

ফৌজিয়ার স্বপ্ন ছিল উচ্চশিক্ষা লাভ করে নিজের জ্ঞানের পরিধি আরও বৃদ্ধি করবেন। কিন্তু পারিবারিকভাবে ভালো সম্বন্ধ আসায় ১৯৮৬ সালে তার বিয়ে হয়ে যায় নিজ উপজেলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব শফিউল আজম খানের সাথে। বিয়ের পরও ফৌজিয়া লেখাপড়া চালিয়ে যান এবং ১৯৮৯ সালে বিএ পাশ করেন। এর মাঝে দু কন্যা সন্তানের জননী হন তিনি। মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি সব সময় ছিলেন অত্যন্ত সচেতন একজন মা। তার ফলস্বরূপ বড় মেয়ে সাবরিনা আজম খান শাওন ম্যানেজমেন্ট স্নাতক (অনার্স) শেষ করেছেন। ছোট মেয়ে ফারজানা আজম খান শাওন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে (অনার্স) অধ্যয়নরত।

সংসারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজের জীবনও পরিপূর্ণ করা যায় – এমন ইচ্ছাশক্তি নিজের মধ্যে অনুপ্রাণিত করে ফৌজিয়া নিজেকে মনোবলের তুঙ্গে নিয়ে যান। ফৌজিয়া খানম একদিকে মা। তারপর আবার রাজনীতি, নারীর ক্ষমতায়নসহ বহুমাত্রিক সমাজকর্ম ও উন্নয়নে যুক্ত হন তিনি। জীবনের চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে আট বছর পর বড় মাপের সমাজকর্মের সুতীব্র বাসনায় জনপ্রতিনিধিত্ব করার বাসনা জাগে তার মনের মধ্যে। সে সময় এলাকাবাসী তার কর্ম উদ্দীপনা, মনোবল আর আত্মবিশ্বাস দেখে উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদন্দ্বী হওয়ার আহ্বান জানায় তাকে। কিন্তু তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার রাজনীতি করাকে ভালোভাবে মেনে নেয়নি। প্রায়ই স্বামীর সাথে এ নিয়ে ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি হত। কিন্তু শত বাধা বিপত্তিও তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ফৌজিয়া ২০০০ সালে রাউজান পৌরসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে পৌর কমিশনার নির্বাচিত হন। পর পর দু বার জনগণ ফৌজিয়া খানমকে কমিশনার নির্বাচিত করে। এর মাধ্যমে তারা বুঝিয়ে দেন যে, নারীরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারে।

ফৌজিয়া আপার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে, আপনার এই যে জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি হয়ে ওঠা এর পেছনে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে নেয়া প্রশিক্ষণ কতটা ভূমিকা রেখেছে? আপা বিস্ময় চোখে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'আজকে পুরো রাউজানবাসীর খুব কাছে আসার পেছনে এবং নিজের জড়তা ভেঙে জনগণের অধিকার আদায়, সমাজের অবহেলিত নারীদের সহায়তা করার মূল প্রেরণা আমি পাই ২০০৬ সালে চট্টগ্রাম শহরে নেওয়া 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি গর্বিত।' তিনি বলেন, 'এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমি আলোকিত পথের সহজ সন্ধান পেয়েছি।'

তারপর আরও পরিসরে জনসেবার লক্ষ্যে ফৌজিয়া খানম ২০০৯ সালে প্রথমবার, এবং ২০১৪ সালে দ্বিতীয়বারের মত রাউজান উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভও করেন তিনি। এ পদে থেকে ফৌজিয়া খানম আগের চেয়ে আরও বেশি উজ্জীবিত হয়ে নারীদের সংগঠিত করে নারী অধিকার আদায়, তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ নানারকম সহযোগিতা দিয়ে নারীদের এগিয়ে নিতে কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া এলাকার দুস্থ, গরীব ও অসহায় নারীদের জন্য সেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন ফৌজিয়া খানম, যেমন, মৎস্য চাষ, বিভিন্ন কুটির শিল্প ও শাক-সবজি চাষের ওপর প্রশিক্ষণ। এছাড়াও বিধবা ও বয়স্ক নারীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, পারিবারিক নির্যাতন ও ইভটিজিং রোধ বন্ধ করা এবং ন্যায়বিচার বঞ্চিতদের আইনি সহায়তা প্রদানে ভূমিকা রাখছেন।

ফৌজিয়া খানম বর্তমানে রাউজান উপজেলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী। উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং কুন্ডেশ্বরী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির শিক্ষানুরাগী হিসেবে যুক্ত আছেন। সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট তাকে নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে সংবর্ধনা, ২০১৪ সালের ২১ শে নভেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে মহাত্মা গান্ধী পিস অ্যাওয়ার্ড এবং একই বছরের ২৬ শে ডিসেম্বর স্বাধীনতার ৪৩ বছর পূর্তিতে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেন।

ফৌজিয়া খানম মনে করেন– নারীর প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য তার আরও কাজ করার রয়েছে। সে স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে আগামীতে জাতীয় সংসদ সদস্য হওয়ার দৃঢ় অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন তিনি। সর্বোপরি, জনগণের ভালবাসা নিয়ে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে চান ফৌজিয়া খানম।

অপরাজিতা তাপসীর চোখে স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন

মেহের আফরোজ মিতা

রিফাত জাহান তাপসী। দক্ষিণের বঞ্চিত নারীদের এক ভরসার নাম। তার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর কথা বলে নিপীড়িত ও নির্যাতনের শিকার হওয়া মানুষের পক্ষে। বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার একটি গ্রাম রহমতপুর। এ গ্রামের এক রাজনৈতিক ও স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম নেন তিনি। বাবা আব্দুল মতিন হাওলাদার বিভিন্ন মেয়াদে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং মা মঞ্জুয়ারা বেগম একজন গৃহিণী। চার ভাই আর দু বোনের সঙ্গে হাসি-আনন্দ আর ভালবাসা নিয়েই পরিবারে বেড়ে উঠতে থাকেন তাপসী।

বাবুগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৭ সালে এসএসসি পাশ করে তিনি ভর্তি হন বাবুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে। স্কুল জীবন থেকেই তাপসী যুক্ত ছিলেন নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। বাবুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন কৃতিত্বের সাথে। বাবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান থাকার সুবাদে সবাই ভালোবাসতো তাপসীকে। এর পাশাপাশি তার অমায়িক ব্যবহার জয় করে নিয়েছিল সবার হৃদয়। ১৯৯১ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন একই এলাকার একেএম মনিরুজ্জামান-এর সঙ্গে। সুখে ভরপুর একটি নীড় বাঁধেন আর দশটা মেয়ের মতই। তখনও কি কেউ জানতো এই মেয়েটিই হবে বাবুগঞ্জ উপজেলার নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান! কিন্তু তাপসী তার কর্মদক্ষতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন– ইচ্ছে করলে নারীরা অনেক কিছুই করতে পারে। ঘুণেধরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন নারী সৃষ্টিশীল এবং অপরাজিতা।

গত ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় তার বাবা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ছিলেন। তার বাবার জনসমর্থন দেখে ঘাবড়ে যায় প্রতিপক্ষরা। নির্বাচনের শেষ দিকে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিশেষ কায়দায় একটি গাড়ি উঠিয়ে দেয়া হয় তার বাবার ওপর। নির্বাচনের একেবারে শেষ সময়ে তার বাবা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে থাকেন। একটি পা ভেঙে যাওয়ায় চিরতরে পঙ্গু হয়ে যান তিনি। এমন সময় বাবার দীর্ঘদিনের গড়ে তোলা রাজনৈতিক ভাবমূর্তির হাল ধরেন যোগ্যতম কন্যা তাপসী। বাবার হাত ধরেই তাপসীর রাজনীতির মাঠে আসা, রাজনৈতিক দীক্ষা ও পাঠ তার কাছ থেকেই পাওয়া। সংশপ্তকের মত বাবার নির্বাচনের সব দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে বেরিয়ে পড়েন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনিই চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী! গ্রাম-গঞ্জে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে তার বাবার অঙ্গীকারগুলো জানিয়ে ভোট প্রার্থনা করতে থাকেন। তার নখদর্পনে চলে আসে বিভিন্ন নির্বাচনী কলাকৌশল। সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর আয়োজনে ভোটার-প্রার্থী মুখোমুখি অনুষ্ঠানেও বাবা অসুস্থ থাকায় তার পক্ষে অংশ নিয়ে জনগণের প্রশ্নের উত্তর দেন তাপসী। তাপসীর বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রাণবন্ত কথাবার্তা মনে ধরে জনতার। সবমহলে প্রশংসিত হয় তাপসীর ভূমিকা। এতে পরোক্ষভাবে আরও ইমেজ বাড়তে থাকে তাপসীর বাবার। কোণঠাসা হয়ে পড়ে প্রতিপক্ষরা। অবশেষে জয় হয় তাপসীর। বিপুল ভোটে আবারও তার বাবা রহমতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর থেকেই এলাকার মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছা মনে দানা বাঁধতে শুরু করে তাপসীর। একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে এলাকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের স্বপ্ন দেখা দেয় তার চোখে-মুখে।

তবে কীভাবে কাজ শুরু করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সমাজের উন্নয়নে তার ভূমিকা কী হওয়া উচিত? খুঁজে পাচ্ছিলেন না এসব প্রশ্নের উত্তর। জীবনের এমন এক মুহূর্তে পরিচয় হয় আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর বরিশাল অঞ্চলের সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ মিতা আপার সাথে। মিতা আপা তাপসীর কথাগুলো জেনে তাকে একটি প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার পরামর্শ দেন। তার আমন্ত্রণেই বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে (৭২তম ব্যাচে) অংশ নেয়ার সুযোগ ঘটে তাপসীর। সদস্য হন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর। তাপসীর মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার সাথে হুবহু মিলে যায় প্রশিক্ষণের কথা-বার্তা। অন্তরে ধারণ করতে থাকেন আত্মনির্ভরশীল হওয়ার দীক্ষা। মুখের কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করতে চান– 'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি'।

প্রশিক্ষণ শেষে নারীদের প্রতি প্রচলিত বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তাপসী। প্রশিক্ষণের পর তাপসী সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কার্যক্রম বাস্তবায়নে দৃশ্যমান সফলতা অর্জন করায় সামাজিকভাবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। শিশুদের জন্মনিবন্ধন, বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণসহ পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ বন্ধ ও যৌতুক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন তিনি। এসব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে বাবুগঞ্জ এলাকায় এক ধরনের গণজাগরণ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তাপসী। একজন সাধারণ গৃহবধূ থেকে ধীরে ধীরে জনগণের নেত্রী হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে জনসম্পৃক্ততা। জনগণের দাবির মুখে তাপসী ২০১৩ সালের বাবুগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী হন। নির্বাচন করাটা ছিল একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। একজন গৃহবধূ রাজনৈতিক মাঠ দখল করবেন, বিষয়টা একেবারে সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তাপসী নিজ মেধা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে লাভ করেন ক্ষমতাসীন দলের সমর্থন। একদিকে ছিল যেমনি বাঘা বাঘা প্রার্থী। আর নির্বাচন শুরু হওয়ার মাত্র ১৫ দিন আগে তাপসী জন্ম দেন একটি ফুটফুটে শিশু। সেই নবজাতক শিশুটিকে নিয়েই কাটাতে হয়েছে তার নির্বাচনী কার্যক্রম। একদিকে মাতৃত্ব আর অন্যদিকে নেতৃত্ব। এ যুদ্ধেও জয়ের মালা তাপসী-ই ছিনিয়ে আনেন। ২৬ হাজার ৬ শ' ভোট পেয়ে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর তার দায়িত্ব বেড়ে যায় বহুগুণ। তাপসী বর্তমানে সদস্য হিসেবে যুক্ত আছেন জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সহ বিভিন্ন সংগঠনে। সমাজ উন্নয়নে অবদানস্বরূপ তিনি অর্জন করেন নানা পুরস্কার ও সম্মাননা। অনেক সমস্যা ও সংকট পেরিয়ে তিনি আজ অনেকটাই পরিপূর্ণ। তবুও হাঁটতে হবে আরও অনেকখানি পথ। নিজেকে আরও বিকশিত করা এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমৃত্যু নিজেকে নিবেদিত রাখতে চান তিনি।

'নারীদের এখন এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। আর গৃহবন্দী হয়ে থাকার সময় নেই। নারীরা ক্ষমতায়িত হলে পুরো সমাজ ক্ষমতায়িত হবে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সবসময়ই নারীর অগ্রযাত্রার পথ রুদ্ধ করতে চাইবে। তাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের সংগঠিত হতে হবে'– বলছিলেন রিফাত জাহান তাপসী।

মানুষের সেবায় প্রতিনিয়ত নিয়োজিত রেহানা বেগম

রিয়াজ মোর্শেদ

উষ্ণ শীতের আবহাওয়ার মধ্যেও ব্যস্ত বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদ। পরিষদের দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে হাতের বামদিকে করিডোরে প্রথম কক্ষের দরজার ওপরে লেখা নাম রেহানা বেগম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি কিছু কাজ সারতে পাশের কক্ষে গেছেন বলে জানায় তার সহকারী। কিছুক্ষণ পরই রেহানা বেগম তার কক্ষে এসে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলেন আরও কিছু লোকজন। প্রত্যেকেই কোন না কোন সমস্যার সমাধান চাইতে এসেছে তার কাছে। সবার সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন দুই দুই বার নির্বাচিত এই জনপ্রতিনিধি। এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাদের সময় দিলেন। গল্পের মত বলে গেলেন তার ফেলে আসা দিনগুলো আর জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার গল্প।

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের আবদুল গনি মিয়ার ঘরে জন্ম তার। দশ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ষষ্ঠ। শৈশব কাটে তার নিজ গ্রাম কাগাশুরাতেই। প্রাথমিক শেষ করার পর বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা আসা সত্ত্বেও বাবার অনপ্রেরণায় তিনি এসএসসি পাশ করেন।

১৯৮৭ সালে এসএসসি পাশের পর শুরু হয় তার নতুন জীবন। একই গ্রামের সরকারি চাকুরীজীবি নুরুল ইসলামের সাথে রেহানার বিয়ে হয়। স্বামীর চাকুরির সুবাদে চলে আসেন সাতক্ষীরায়। বিয়ের পর অনেকেই লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। কিন্তু রেহানা বেগম বিয়ের পরও তা অব্যাহত রাখেন। এর ফলস্বরূপ তিনি তালা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। এরপরও বসে না থেকে বিএ-তে (প্রাইভেট) ভর্তি হন এবং পাশাপাশি একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকুরি নেন। সংস্থা থেকে দেয়া বাধ্যবাধকতার কারণে মোটরবাইক চালিয়েই চাকুরি করতে হতো রেহানাকে। সেই সময়কার সমাজ তার মোটরবাইক চালানোকে সহজভাবে মেনে নেয়নি। কিন্তু তিনিও দমে যাওয়ার পাত্রী নন। সমাজের তাচ্ছিল্য উপেক্ষা করেই এগিয়ে যান রেহানা বেগম। তিনি ধীরে ধীরে মাঠকর্মী থেকে ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় তিনি নারী আর শিশুদের নিয়ে কাজ করতেন। নব্বইয়ের দশকের সেই অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, সে সময়ে নারীদের ঘরের বাইরে বের হওয়াই ছিল অনেকটা অসম্ভব। ধর্মীয় সম্প্রদায়ও ছিল প্রখর সমালোচনা মুখর। সেইসব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে কাজ করবার অভিজ্ঞতা আজও অনুপ্রেরণা যোগায় রেহানা বেগমকে।

এদিকেও চাকুরির পাশাপাশি শুধু বিএ নয়, এম-টাও পাশ করে ফেলেন রেহানা বেগম। সাতক্ষীরায় চাকুরিরত অবস্থায়ই তিনি দু সন্তানের জননী হন। তারপরই চলে আসেন নিজের গ্রাম কাগাশুরাতে। সেখানেই একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশার জন্য আবেদন করেন এবং চাকুরিটা হয়েও যায় তার। শুরু হয় তার ভিন্ন জীবনের পথচলা। ধীরে ধীরে শিক্ষকতার পাশাপাশি গ্রামের বিচার-সালিশেও ডাক পড়ে তার। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি চলে আসেন রাজনীতিতে।

২০১০ সালে রেহানা বেগম বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের প্রতিটি সেশনে ওঠে আসে তার নিজের জীবনের এবং চারপাশে বিরাজমান নারীর সত্যিকারের অবস্থা ও অবস্থান। পিতৃতন্ত্র ও নারীর ক্ষমতায়নের সেশনটি তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে, তার চিন্তার জগতে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। পরবর্তীতে মাসিক ফলোআপ সভাগুলোতে অংশগ্রহণ তাকে নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীদের বঞ্চনার বিষয়টি তাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। এই শৃঙ্খল ভাঙার জন্য আরও বড় পরিসরে কাজ করার অনুপ্রেরণা পান তিনি। নিজেকে নিয়োজিত করেন মানব সেবায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি সাতক্ষীরায় নারী ও শিশুদের নিয়ে কাজ করতেন। প্রশিক্ষণের পর আবারও তিনি সেই

ধরনের কাজ শুরু করলেন। এবার তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এবং স্থানীয় নারীনেত্রীদের সহায়তায় বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বন্ধে ভূমিকা পালন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের পাশে দাঁড়ান এবং সহযোগিতা করেন।

একজন ভাল সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও নারী হওয়ার কারণে তাকে বিভিন্ন সময় অবহেলার শিকার হতে হয়। পিছিয়ে যেতে হয় যোগ্যতম পদ থেকে। কিন্তু তিনি কখনো হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেননি। যে কারণে তিনি আজ নিজ ইউনিয়ন ছাপিয়ে উপজেলা পর্যায়েও ব্যাপক সমাদৃত। পরপর দু বার বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের এই পদটিতে কাজের চাপ ও সুযোগ কম। তবুও তিনি মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এতেই শান্তি পান রেহানা বেগম।

সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন সংসারে তেমন একটা সময় দিতে পারেন না– এমন অভিযোগ তার সন্তানদের। উদাহরণ হিসেবে ছেলের সাথে একটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে রেহানা জানান, একদিন তিনি সকালে ঘর থেকে বের হননি, তখন ছেলে ক্যালেন্ডারের পাতায় একটি লাল দাগ দিয়ে রাখলেন যে, তার মা আজ বের হননি। কিন্তু বিকেলেই আবার তিনি বেরিয়ে গেলেন। আর তখনই ছেলে হতাশ হয়ে লাল দাগটি মুছে ফেললো। এভাবেই রেহানা বেগম মানুষের সেবায় প্রতিনিয়ত নিজেকে নিয়োজিত রাখছেন, অন্য নারীদের জন্য হয়ে উঠছেন অনুপ্রেরণার উৎস।

ডালিয়া নাসরিনের ফুল হয়ে সুবাস ছড়ানোর গল্প

সোহানুর রহমান সোহান

যুগ যুগ ধরে কোমলতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে নারী। তারাই আজন্ম লালিত ধ্যান-ধারণার মমতাময়ী বাহক। এই সুনির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে কেউ কেউ যে বেরিয়ে আসতে চান না তা নয়। তবে প্রবল ইচ্ছাশক্তি, প্রতিকূলতা এড়িয়ে সামঞ্জস্যকর সুব্যবস্থাপনায় মুষ্টিমেয় মানুষই উদ্ভাসিত হতে পারেন পাদপ্রদীপের আলোয়। অনেক ক্ষেত্রে তারাই পরিণত হন ইস্পাত কঠিন রমণীতে। কিন্তু এর আগে চাই সুষম সামাজিক অধিকার বণ্টন ও কর্মক্ষমতা প্রয়োগের সমান্তরাল সুযোগ। বর্তমানে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে একজন নারী শুধু তার কোমলতা, পেলবতা ও সৌন্দর্যকে অবলম্বন করে সমাজে টিকে থাকছেন না; বরং রূপ ও গুণের সমন্বয় ঘটিয়ে নারীরা তাদের অবস্থানকে আরও দৃঢ়, সুসংহত ও সময়োপযোগী করে তুলছেন, যার ফলে নারী শুধু সুন্দরের প্রতিভূ – এ কথাটি ভুল প্রমাণিত হচ্ছে সময়ের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে।

বর্তমান সময়ে নারীরা তার পেশাজীবনকে গৎবাঁধা নিয়মের বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সব পেশাতেই সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। তেমনই একজন সফল নারী শিক্ষাকর্মী নলছিটির ডালিয়া নাসরীন। প্রায় ২০ বছর ধরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব পালন করছেন একেবারে বিনা পারিশ্রমিকে। শুধু শিক্ষকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আত্ম-নিবেদিতভাবে তিনি নেমে পড়েছেন অবহেলিত মানুষের সেবায়। দুই দুইবার নির্বাচিত হয়েছেন জনপ্রতিনিধি তথা নলছিটি উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান।

বেড়ে ওঠা

১৯৫৯ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারির এক রোদ্র ঝলমল দিনে যশোর জেলাধীন অভয়নগর উপজেলার রাজঘাট ইউনিয়নের একতারপুরে গ্রামে জন্ম নেয় একটি কন্যাশিশু। মা-বাবা আকিকা দিয়ে আদরের সন্তানের নাম রাখেন ডালিয়া নাসরীন। ডাক নাম ডালিয়া। বাবা বখতিয়ার রহমান ফরাজি আর মা রওশন আরা বেগম-এর আদর-যত্নে চার ভাই ও চার বোনের মাঝেই বেড়ে উঠতে থাকেন ছোট্ট ডালিয়া। বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরিজীবী আর মা ছিলেন সফল গৃহিণী। একতারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে ডালিয়া ভর্তি হন রাজঘাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। লেখাপড়ার সময়েই তিনি যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ডালিয়া রাখেন তার সফলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

জীবন শুরুর গল্প

শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে বাবা-মার কাছে অনেক স্বাধীনতা এবং সুযোগ পেয়েছেন ডালিয়া। তিনি বলেন, 'আমার মা-বাবা আমাদের ছোটবেলা থেকেই আত্মনির্ভরশীল হতে শিখিয়েছেন। ভাই-বোনদের মধ্যে একমাত্র আমিই সর্বোচ্চ পর্যায়ে পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছি।' মা-বাবার উৎসাহে ডালিয়া বরাবরই ভাবতেন যে, তিনি জীবনে ভিন্ন কিছু করবেন, যার মাধ্যমে তিনি সমাজ ও দেশের মঙ্গল সাধনে ভূমিকা রাখতে পারবেন। চোখে এক অসাধারণ দৃঢ়তা নিয়ে তিনি বললেন, 'সবসময় ভাবতাম আমি কখনো ঘরে বসে থাকবো না, এমন কিছু করব যার মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনা যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে এম-এ (মাস্টার্স) পড়াশোনার পাশাপাশি ডালিয়া নাসরীন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন উন্নয়ন সংগঠন ব্র্যাক-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে। এ পেশায় আসার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাকে উৎসাহ যোগান। এরপর শুরু হয় তার অবিরাম পথচলা। তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সাথে। কয়েক বছর এ পেশায় সফলতার সাথে পার করার পর ১৯৯৬ সালে ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার ভৈরবপাশার আব্দুল হকের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ডালিয়া। পেশাজীবনের পাশাপাশি এক মেয়ে ও এক ছেলে এবং স্বামীকে নিয়েই তার সুখের সংসার। সব কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা পান তার পরিবার থেকে। পেশা জীবনের প্রথমে ডালিয়া নাসরীন ছিলেন ছিলেন একজন সমাজ সেবিকা। একজন নারী শিক্ষিত হলে পুরো সমাজ শিক্ষিত

হবে, এমন মন্ত্র ধারণ করে ১৯৯৭ সাল থেকে ভৈরবপাশা উদয়ন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর অবৈতনিক প্রধান শিক্ষক হিসেবে আজকের দিন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

বাবার বাড়িতে যেমনভাবে কোনো অভাব-অভিযোগ ছিল না, তেমনি স্বামীর সংসারেও ছিল না কোনো অভাব বা অপূর্ণতা। তবুও কিসের যেন একটা চাহিদা তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। সমাজের নির্যাতিত, নিপীড়িত নারীদের জন্য তার মনটা নীরবে নিভৃতে কাঁদত। মনে মনে ভাবলেন, নারীদের শুধু শিক্ষিত হলেই চলবে না, পাশাপাশি নারীদের ক্ষমতায়িতও হতে হবে। পাল্টে দিতে হবে ঘুণেধরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে। নিজেকে ক্ষমতায়িত করতে অবশেষে রাজনীতির মাঠে নামলেন ডালিয়া নাসরিন। ২০০৯ সালে তিনি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী হন উপজেলার পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে। জনগণের ভালবাসায় বিপুল ভোট পেয়ে প্রথমবারেই বিজয়ের মুকুট পড়েন তিনি।

জীবনের নতুন মোড়

আশাবাদী ডালিয়া নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার আগেই বলেছিলেন, তার স্বপ্ন নলছিটিবাসীর জন্য কিছু করা। সেই স্বপ্ন পূরণে আবারো মাঠে নামেন ডালিয়া। স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য পুরোপুরি উজাড় করতে চান নিজেকে। তবে নির্বাচিত হওয়ার পর স্বপ্নপূরণের জয়যাত্রা কীভাবে শুরু করবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছিলেন না। এমন মূহুর্তে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর বরিশাল অঞ্চলের সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ মিতার সাথে পরিচয় হয় ডালিয়ার। মিতা আপার পরামর্শ ও আমন্ত্রণে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত ২০১০ সালে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে (৫৪তম ব্যাচে) অংশ নেন তিনি। এরপর ডালিয়ার নিজের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। নিজের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নপূরণে সহায়ক পরিবেশ বিনির্মাণে এ প্রশিক্ষণটি তার জীবনে একটি মাইলফলকের ভূমিকা পালন করে। বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সদস্য হিসেবে নতুন উদ্যমে আবারো ঝাঁপিয়ে পড়েন, অগ্রণী ভূমিকা রাখেন নারী ও শিশু নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে। বিগত মেয়াদের পাঁচ বছর ধরেই রাজনীতির মাঠেই পড়েছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি রাজনীতিতে আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠেন। নিজেকে ব্যস্ত রাখেন মিছিল-মিটিংসহ নানা কর্মসূচিতে। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। পরের বারও (২০১৪ সালে) বাঘা বাঘা প্রতিপক্ষকে পেছনে ফেলে ঠিকই আদায় করে নেন জনগণের সমর্থন। বিপুল ভোটে আবারও নলছিটি উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ডালিয়া নাসরীন।

অপরাজিতা

নির্বাচিত হওয়ার পর উপজেলা পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একজন জনপ্রিয় ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন জনগণের মনের মণিকোঠায়। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও চড়াই উৎরাই পেরুতে সব সময়ে কাজে লাগিয়েছেন 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণের পাঠ। আর স্বামী ভৈরবপাশা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আঃ হক প্রতিমুহূর্তে জুগিয়েগেছেন অনুপ্রেরণা। ডালিয়া বলেন, যদিও আমাদের এ পেশায় অবসরের সুযোগ খুব কম, সবসময় জনসেবা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়, তারপরও যখন সুযোগ পাই তখন আমার পরিবার-পরিজনদের সাথে একটু হলেও সময় কাটাই।

২০১৩ সালে তিনি বঞ্চিত নারীদের সংগঠিত করতে গড়ে তোলেন বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন 'আংগিনা'। সারাদিন বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি এ সংগঠনের মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুরোধে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি

পরিচালনা করছেন তিনি। শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও থেমে নেই সংস্কৃতি চর্চা। সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন তার নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিভা সঙ্গীত বিদ্যালয়ে। সেখানে কচিকাঁচা শিশুদের গান শেখানোর ফাঁকে একটু ফুসরত পেলেই গুনগুনিয়ে গান ধরেন আপন মনে– 'তোমরা ভুলে গেছ মল্লিকা দি'র নাম'।

সফলতার শিখরে

'আমি যখন উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় হই তখন সমাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম। আর এখন দিন দিন নারীদের অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। কারণ নারীর জয়ে সবার জয়। নারীর উন্নয়ন মানে বাংলাদেশের উন্নয়ন' বলছিলেন ডালিয়া নাসরীন। তাই নারীদের ক্ষমতায়িত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান তিনি।

বর্তমানে ডালিয়া নাসরিন সদস্য হিসেবে যুক্ত আছেন জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠনে। নানা পুরস্কার ও সম্মাননা রয়েছে তার ঝুলিতে। নারীদের উন্নয়নে এবং জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করায় অর্জন করেছেন জয়িতা পুরস্কার ও সুফিয়া কামাল ফেলোশিপ। শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে উন্নয়ন সংস্থা 'আদর্শ কাজের সন্ধানে' (আকাস) থেকে পেয়েছেন বিশেষ সম্মাননা।

অনেক সমস্যা ও সংকট পেরিয়ে ডালিয়া নাসরিন আজ অনেকটাই সফল এক নারীনেত্রী ও সংগঠক। শেকড় থেকে আরোহণ করেছেন সফলতার শিখরে। নিজেকে আরও বিকশিত করা এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমৃত্যু নিজেকে নিবেদিত রাখতে চান তিনি।

জোসনা খাতুনঃ ক্ষমতায়িত নারীর এক উজ্জ্বল উদাহরণ

মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল

মাতৃহীন সন্তান জোসনাকে নিয়ে বাবা ইদ্রিস আলী পড়েন মহাসংকটে। উপায়ন্তর না দেখে সমাজের গৎবাঁধা নিয়মে বিয়ে ঠিক করে কিশোরী জোসনার। মা মহিতুনেচ্ছা বেঁচে থাকলে হয়তো এমনটা না-ও ঘটত জোসনার জীবনে।

১৯৭১ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজারের কল্যান্দীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেন বেগম জোসনা খাতুন। বাবা-মা মোঃ ইদ্রিস আলী ও মহিতুননেচ্ছার আট সন্তানের মধ্যে জোসনার অবস্থান ষষ্ঠ। ষষ্ঠ সন্তান হওয়া সত্বেও বাবা-মায়ের কাছে জোসনা ছিলেন অন্যদের থেকে একটু বেশিই আদরের। তার চাওয়া-পাওয়া ছিল অন্যদের থেকে যেন একটু আলাদা ধরনের। এই ভিন্নতাই যেন তাকে বাবা-মায়ের কাছে বেশি আদরের করে তোলে।

বড় পরিবার হওয়া সত্ত্বেও ইদ্রিস আলী ও মহিতুনেচ্ছা সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত যত্নশীল। জোসনা লেখাপড়ার ব্যাপারেও তার অন্য ভাই-বোনদের থেকে ছিলেন বেশি আগ্রহী। প্রত্যেক শ্রেণিতে বরাবরের মত প্রথম হওয়া ছাত্রী জোসনার লেখাপড়া-সহ অন্যান্য কাজকর্ম ভালই চলছিল। তিনি যখন চতুর্থ শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন, তখন একদিন জোসনার স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব ওয়াহিদুজ্জামান তাদের বাড়িতে এসে তাঁর বাবাকে বলেন, তোমার এ মেয়ে আমাদের স্কুলের মান রক্ষা করবে। ওকে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়াতে হবে। বাবা-মাও জোসনার ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হন। এরই মধ্যে জোসনার মাতৃ বিয়োগ যেন বিনা মেঘে বজ্রঘাত।

এরই মধ্যে জোসনার লেখাপড়ায় বাঁধ সাধে একই গ্রামের এক ধনাঢ্য পরিবারের আদরের বাউন্ডেলে সন্তান সহিদুল্লাহ। যার নিত্যকার কাজ ছিল ঘুম থেকে উঠে রাস্তার মোড়ে বখাটেপনা করা। তার বখাটেপনা গিয়ে পড়ে মেধাবী জোসনার উপর। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া ও আসার সময় সহিদুল্লাহ জোসনাকে নানাভাবে বিরক্ত করা শুরু করে। যত দিন যায় তাকে বিরক্ত করার মাত্রাও বাড়তে থাকে। ভেতরে ভেতরে জোসনা সঙ্কুচিত হতে থাকেন। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে সহিদুল্লাহ জোসনার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। জোসনা বিষয়টি পরিবারকে জানায়। জোসনার পরিবার সহিদুল্লাহ'র পরিবারের সাথে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন লাভ হলো না। এমনকি জোসনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকও সহিদুল্লাহ'র পরিবারের সাথে কথা বলেন। কিন্তু বিধি বাম, এর জের ধরেই জোসনার নিয়মিত স্কুল জীবনের ইতি ঘটে।

১৯৮৯ সালে পাশের ছোট বাড়িপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মুক্তিযোদ্ধা এস এম ফজলুর রহমান-এর সাথে ঘটা করে বিয়ে হয় জোসনার। শুরু হয় অন্য আরেক জীবন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম অনুসারে শ্বশুরালয়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব গিয়ে পড়ে জোসনার উপর। পুতুল খেলার বয়সেই জোসনাকে পালন করতে হয় একান্নবর্তী সংসারের সমস্ত দায়িত্ব। জোসনার স্বামী পেশায় স্কুল শিক্ষক এবং মানসিকতায় আধুনিক। তিনি জোসনার অব্যক্ত মনের কষ্টগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতেন। এটাই ছিল জোসনার ভগ্নহৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনা। তিনি সর্বদা জোসনার সৃষ্টিশীল মনকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। একান্নবর্তী পরিবারের দায়-দায়িত্ব পালন করতে করতে একটুও ফুসরত পেতেন না জোসনা। এর মধ্যেই জোসনা তার নিজের ভেতর আরেক প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করেন। সময় যেতে না যেতেই জোসনা'র কোলজুড়ে আসে একটা ফুটফুটে পুত্র সন্তান। কিন্তু জন্মের মাত্র ১১ মাস বয়সে পানিতে ডুবে মারা যায় তার সন্তানটি। এবার একেবারে ভেঙে পড়েন জোসনা। স্বামী এস এম ফজলুর রহমান বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তাকে আবারও পড়াশুনার সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। মেধাবী জোসনার পাঠক মন স্বামীর এ প্রস্তাবে যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। এর এক বছর পর আবারও জোসনার কোলজুড়ে আসে আরেকটি পুত্র সন্তান। এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জোসনা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৯৯ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ভাগ্যদেবী যেন সব সময় তাকে পিছনের দিকে

টেনে ধরতে চায়। এরই মধ্যে জোসনার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি মারা যান। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে তাদের একটা নতুন সংসার শুরু হয়। এখানেও নতুন বিপত্তি তৈরি হয়। স্বামীর জোগাড়ের টাকায় সংসারের ব্যয়ভার সঙ্কুলান করা কঠিন হয়ে দাড়ায়।

সর্বাংসহা বেগম জোসনা খাতুন যখন দিশেহারা প্রায়, তার স্বপ্নের কুঁড়িগুলো যখন শুকাতে বসেছে এরকম একসময়ে তিনি যান আড়াইহাজার উপজেলা পরিষদের সমাজ সেবা কার্যালয়ে কিছু ঋণ পাওয়ার আশায়। উদ্দেশ্য ওই ঋণের টাকা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে লাগানো। এ সময় উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা জোসনা খাতুনের আগ্রহ ও অস্থিরতা দেখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একটি প্রশিক্ষণ নেয়ার পরামর্শ দেন। জোসনা কিছুটা বিরক্ত হয়েই ফিরে আসেন সমাজ সেবা কার্যালয় থেকে। তিনি আরও ভেঙে পড়েন। এর বেশকিছু দিন পর উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তার উদ্যোগে আড়াইহাজার পাইলট হাইস্কুলে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি আয়োজনের সংবাদ সমাজ সেবা কর্মকর্তা জোসনা খাতুনের নিকট পৌঁছে দেন এবং তাকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ০০০ সালে জোসনা আড়াই হাজার পাইলট হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (৯১৯তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণটি যেন তার অন্ধকার জীবনে আলোকবর্তিকা হয়ে আসে। নিজের মধ্যে এক বিপুল আত্মশক্তি অনুভব করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে বাড়ি ফিরে জোসনা তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন যে, তাকে উপার্জনমূলক কিছু একটা করতে হবে। স্বামীর উৎসাহে তিনি কাজে নেমে পড়েন। স্বামীর আয়ে পরিবারের ভরণপোষণ যথাযথভাবে সঙ্কুলান না হওয়ায় বাড়তি আয়ের জন্য গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ, জমি বর্গা উসলী নিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে নিজেকে যুক্ত করেন।

শত প্রতিকূলতার মাঝেও জোসনা যেটি থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হয়নি, সেটি হচ্ছে তার লেখাপড়া। তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তিনি শুধু নিজেকে নিয়েই না ভেবে সমাজের অন্যদেরকেও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেন। সমাজের স্বল্প আয়ের নারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'নারী কল্যাণ সমিতি'। সমিতির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, সচেতন করার লক্ষ্যে উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা, র‍্যালিসহ নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন জোসনা খাতুন। এ সমিতির তহবিল হতে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে সমিতির অনেক সদস্যই এখন স্বাবলম্বী।

জোসনা এখন তিন সন্তানের জননী, হাজার ব্যস্ততার মাঝেও সন্তানদের ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান তিনি। সন্তানদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তার তিন সন্তানের মধ্যে প্রথম সন্তান স্নাতকোত্তর, দ্বিতীয় সন্তান মালয়েশিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এরোনোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যয়নরত এবং একমাত্র মেয়ে এমবিএ-তে পড়ছে।

পেছনে ফিরে তাকাতে চান না জোসনা খাতুন, কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি ডুবে যান স্মৃতি রোমন্থনে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে চঞ্চলা ছোট্ট জোসনা, তখন তার হৃদয় মোচড় দিয়ে ওঠে। আর কোন কন্যাশিশুর অবস্থা যেন তার মত না হয়, সেজন্য তিনি কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সক্রিয় রয়েছেন। তিনি আড়াই হাজার উপজেলায় গড়ে তোলেন জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর কমিটি। তিনি নিজেও এ ফোরাম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ০০০০ সালে জোসনা খাতুন নিজের জানার পরিধিকে আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিষয়ক' ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশ নেন। এ প্রশিক্ষণে বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভয়াবহ চেহারা তার কাছে উন্মুক্ত করে দেয়। তিনি অনুভব করেন, গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই নারীর স্ব-কর্মসংস্থানের পথে বড় অন্তরায়। তাই এ ব্যবস্থা ভাঙতে না পারলে নারীদের অবস্থার উন্নতি অসম্ভব।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে নারীর প্রতি প্রচলিত বৈষম্যগুলো দূর করার জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন মমতাজ। নারীনেত্রী হিসেবে শুরু হয় তার নতুন পথচলা। এরপর থেকে এলাকার মানুষগুলোকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য তার প্রচেষ্টা এখন অনেকের প্রেরণার উৎস। মানুষ হিসেবে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার সংগ্রাম যেদিন শুরু হয়েছিল তার বহমানতা আজ অবধি চলমান। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে সমতার পৃথিবী বিনির্মাণের সাহসী সংগ্রামে লিপ্ত শত শত নারীর মিছিলে এক লড়াকু যোদ্ধা বেগম জোসনা খাতুন।

২০০৬ সালে জোসনা খাতুন আড়াইহাজার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করেন নিজেকে। তিনি এখন উপজেলা সমাজ কল্যাণ সংস্থার সদস্য, উপজেলা সামাজিক উন্নয়ন কমিটির সভানেত্রী, আড়াইহাজার উপজেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা-সহ প্রায় ১৫টি প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অবদান রেখে চলেছেন।

সমাজের অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করার জন্য জোসনা খাতুন হাতে তুলে নেন কলম। শুরু করেন লেখালেখি। স্বনামধন্য জাতীয় দৈনিক ভোরের কাগজে কাজ করার মধ্য দিয়ে তার সাংবাদিক জীবন শুরু হয়। জোসনা খাতুন যেন কবির ভাষার প্রতিচ্ছবি 'প্রবল অটল বিশ্বাস যার, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, কোন বাঁধা তার রোধে নাকো পথ কেবলই সম্মুখে চলে'। সমাজের যেখানে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা সেখানেই হাজির জোসনা খাতুন। পাল্টাতে চায় সমাজটাকে, ভেঙে ফেলতে চায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এই বৈষম্যমূলক নিয়ম-কানুন। জোসনা খাতুন যেন বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। আড়াই হাজারের সেই স্বপ্নচারী ছোট্ট মেয়ে জোসনা, শত বাধা পেরিয়ে আড়াইহাজার প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এতকিছুর পরও যেন জোসনার অতৃপ্ত বাসনা পূরণ হয় না। তাকে এখনো কুরে কুরে খায় সেই বখাটে শহীদুল্লাহ। পথে যখন কোন মেয়ে বা নারীকে ইভটিজিং-এর শিকার হতে দেখেন, তখন যেন তার কাটা গায়ে লবনের ছিটা লাগে। প্রশাসন এসব বিষয়ে সাধারণত তেমন ভূমিকা পালন করে না বা অধিংকাশ সময়ই নীরব থাকে। আড়াই হাজার উপজেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক জোসনা এসব দেখে মনে মনে স্থির করেন, তাকে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এরকম একটা বাসনা থেকেই ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তিনি মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেন। দলীয় সমর্থনও তিনি লাভ করেন। মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মানসিকতা নিয়ে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার বার্তা নিয়ে ছুটে যান উপজেলার ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। ভোটাররাও তাকে হতাশ করেনি। কলস মার্কা নিয়ে ১,১১,৪৮৯ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন জোসনা খাতুন। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে নারী বুথে অন্য প্রার্থীদের তুলনায় তিনি সর্বাধিক ভোট লাভ করেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভোট পান মাত্র ১১,৭৯৯। বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ তার কাজের গতিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সমাজের অবহেলিত মানুষের উন্নয়নে তার ছুটে চলা বৃদ্ধি পায় বহুগুণ। সকাল থেকেই গভীর রাত পর্যন্ত তিনি মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। আড়াই হাজারের এই নারীনেত্রী ও জনপ্রতিনিধি জোসনা খাতুন ক্ষমতায়িত নারীর এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

খন্দকার নুরুন নাহারঃ গৃহিণী থেকে সিটি করপোরেশনের কমিশনার

মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল

দৌড়ে ছুটে আসছে সবার আগে, রাবারের বলের মত দূরে ছুড়ে দিচ্ছে লৌহ গ্লোব –যেন জয় করার নেশায় মেতেছে মেয়েটি। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সব পুরস্কার যেন তার দখল করা চাই। অর্থাৎ যার ছোটবেলা থেকেই ছিল জয়ের নেশা, তিনি কি পারেন ঘরের ত্রিকোনায় বসে থাকতে। সময়ের পরিক্রমায় সেই ছোট্ট মেয়েটি– খন্দকার নুরুন নাহার আজ গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত কমিশনার।

১৯৬৬ সালে নরসিংদী জেলার পলাশ থানার শ্যামল ছায়া ঘেরা চর্ণবর্দী গ্রামের প্রতাপশালী খান পরিবারে জন্ম নেন নুরুন নাহার। বাবা আব্দুল গণি খান ও মা আঙ্গুরা বেগমের দ্বিতীয় সন্তান নুরুন নাহার। আট ভাই-বোনের মধ্যে নুরুন নাহার দ্বিতীয়। নুরুন নাহারের বাবা শিক্ষিত ও সরকারি চাকুরজীবি হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন সমাজব্যবস্থার কারণে অল্প বয়সেই নুরুন নাহারের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। নুরুন নাহার একটু চঞ্চল ও মিশুক হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক বেড়াজাল ও লজ্জার কারণে বিবাহে যে তার সম্মতি নেই– একথা আর বলা হয়ে ওঠে না। ১৯৭৭ সালের ২৫ অক্টোবর পাশের জেলা গাজীপুরের মুন্সিপাড়ার খন্দকার আবুল হোসের সাথে বিয়ে হয়ে যায় নুরুন নাহারের।

শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে হয় নুরুন নাহারকে। বেশ খানিকটা বয়সের পার্থক্য থাকলেও স্বামী আবুল হোসেন শিক্ষিত হওয়ার কারণে নুরুন নাহারের শিশু মনকে তিনি বোঝার চেষ্টা করতেন। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবার হওয়ার কারণে শ্বশুরবাড়িতে যথেষ্ট কড়া শাসনের মধ্যে থাকতে হত নুরুন নাহারকে। খেলার বয়সেই রান্না-বান্না, স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি আর দেবর-ননদদের দায়িত্ব বুঝে নিতে হয় তাকে। সংসারের নানান কাজ করতেই বেশির ভাগ সময় কেটে যেত নুরুন নাহারের। অন্যদিকে সংসারে পান থেকে চুন খসলেই শ্বাশুড়ি ননদদের বকুনী। চঞ্চল ও মিশুক নুরুন নাহারের শিশুমন গুমরে কাঁদতে থাকে।

বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মা হন নুরুন নাহার। তার কোলজুড়ে আসে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান। নাম রাখেন নাজমুল খন্দকার সুমন। অল্প সময়ের ভেতর নুরুন নাহারকে ছয় সন্তানের জননী হতে হয়। নুরুন নাহারের পাঁচ ছেলে এবং এক মেয়ে। একান্নবর্তী সংসার, অন্যদিকে ছয় সন্তানের লেখাপড়া। স্বামীর ছোট্ট ব্যবসা, তাই সংসার ছিল না স্বচ্ছলতা। ফলে সংসারের ভরন-পোষণ যোগাতে স্বামী আবুল হোসেনকে হিমশিম খেতে হয়। একান্নবর্তী পরিবার, সংসারের যাতাকল টানতে গিয়ে বেশির ভাগ সময়ই আবুল হোসেনকে থাকতে হত ঘরের বাইরে। স্বামীর এ কষ্ট তাকে পীড়া দিত। সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনা, সন্তানদের লেখাপড়া শেখানো– এসবই তার মাথায় ভিড় করতো। কীভাবে স্বামীর কষ্ট একটু লাঘব করা যায়। এসব চিন্তা থেকেই নুরুন নাহার হাঁস-মুরগি পালনের ওপর একটি প্রশিক্ষণ নিয়ে গড়ে তোলেন একটি খামার। তারপরও যেন কিছুতেই কিছু হয়ে ওঠে না। এরকম এক পর্যায়ে তিনি স্বাস্থ্য সেবিকা হওয়ার জন্য এর ওপর এক প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। ইতোমধ্যে স্বামীর ব্যবসার পসরও ঘুরতে থাকে। সেবিকার কাজ করতে গিয়ে নুরুন নাহারের মিশুক মন আবারো জাগ্রত হয়ে ওঠে। টাকা রোজগারের পাশাপাশি সেবার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করার কাজ শুরু করেন তিনি। পেশা যেন নেশায় পরিণত হয়। এ নিয়ে তাকে কম কথা শুনতে হয়নি পরিবার থেকে। নারীদের সেবা করতে গিয়ে তার উপলব্ধি হয়, সমাজের মানুষ কত ধরনের সমস্যার মধ্যে দিনাতিপাত করে। আর নারীর ওপর ভয়াবহ নির্যাতন দেখে তার চঞ্চল মন আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার মাথায় ঘুরপাক খায় কীভাবে মানুষের উপকার করা যায়, বন্ধ করা যায় নারীর ওপর নির্যাতন। পারিবারিক বাধা ছিল তার বরাবরই, কিন্তু

স্বামী তাকে সহযোগিতা করতে না পারলেও তার কোনো কাজে বাধা দিত না। নীরবে উৎসাহ যোগাত। এর ভেতর নুরুন নাহারের সন্তানরা বড় হয়ে যায়। বড় ছেলে সুমন ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করে গাজীপুর সদর হাসপাতালের প্যাথোলজী বিভাগে চাকুরি নেন। সন্তানরা সবাই তার মাকে বুঝত। সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করত তার বড় ছেলে সুমন। সুমন তার মাকে সব সময় সামাজিক কাজ করতে উৎসাহ যোগাত। নুরুন নাহার সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও ব্র্যাক-সহ নানা প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

নুরুন নাহার ২০০৯ সালের ১৯ মে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তিনি বুঝতে পারেন– পুরুষতন্ত্র ও এর প্রভাব, সমাজে নারীদের অবস্থা, অবস্থান ও সমস্যা, কেন তারা বঞ্চিত ও নির্যাতনের শিকার হয় এবং এর থেকে উত্তরণের উপায়। তার ভেতর সৃষ্টি হয় নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা।

প্রশিক্ষণ শেষ হয়। নুরুন নাহার ফিরে আসেন গাজীপুরে। এ যেন অন্য এক নুরুন নাহার। একা মানুষ, স্বামী, সংসার সামলে কয়জনকেই সেবা দেওয়া যায়, আর কয়জনের সমস্যা সমাধান করা যায়। তাই তিনি সংঘবদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে মুন্সিপাড়ার নারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন একটি সমবায় সমিতি। তাদের সাথে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণের আলোচনা করেন। তারাও আগ্রহী হয়ে ওঠে। সমিতির ৩০ জন-সহ গাজীপুরের আরও বেশকিছু নারীকে তিনি 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন। ঐ প্রশিক্ষণের পর নুরুন নাহার মুন্সিপাড়ায় আর একা নন। বেড়ে যায় তার সহযোদ্ধা। তাদের নিয়ে গাজীপুরে গঠন করেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর জেলা কমিটি গঠন, যে কমিটিতে তিনি দায়িত্ব নেন সাধারণ সম্পাদক-এর। এখন গাজীপুরের যেখানেই কোন নারীর সমস্যা হয়, ছুটে যান নুরুন নাহার।

পারিবারিকভাবে তার পরিবার বিএনপি'র রাজনীতির সাথে আগে থেকেই যুক্ত। ফলে পারিবারিক প্রভাবেই নুরুন নাহার মুন্সিপাড়া বিএনপি'র মহিলা সম্পাদিকা নির্বাচিত হয়। কিন্তু 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণের আগে নুরুন নাহার কথা বলতে পারতেন না, ভয় পেতেন। কিন্তু প্রশিক্ষণের পর সে ভয় কেটে যায়। নুরুন নাহার প্রতি মাসে ছুটে যান দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে (মোহাম্মদপুর, ঢাকা) নারীনেত্রীদের মাসিক ফলোআপ সভায় যোগ দেয়ার জন্য। নারীনেত্রী হিসেবে দীর্ঘ চার বছরের পথচলা নুরুন নাহার করে তোলে উদ্দীপ্ত, জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তার ভেতর তৈরি হয় নেতৃত্ব দেয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

২০১৩ সালে সরকার গাজীপুরকে সিটি করপোরেশন ঘোষণা করে এর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সদস্য ও মুন্সিপাড়ার নারীরা নুরুন নাহারকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগান। তাদের উৎসাহে নুরুন নাহার ২৫, ২৬ ও ২৭ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডে (মহিলা) কমিশনার পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেন। তার দল বিএনপিও তাকে সমর্থন দেয়। এই ওয়ার্ডে ১১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। হরিণ মার্কা নিয়ে তিনি ছুটে যান ভোটারদের কাছে। গাজীপুরে রয়েছে অসংখ্য কারখানা (বেশিরভাগই তৈরি পোশাক কারখানা)। ফলে এখানকার অধিকাংশ নারীই শ্রমিক। তাদের বঞ্চনা প্রতিরোধ করা, কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই হয় নুরুন নাহারের নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকারগুরো তিনি পূরণ করতে

পারবেন– এ প্রত্যাশায় ভোটাররা তাকে (১১ হাজার ভোট পেয়ে) নির্বাচিত করে। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে তিন হাজার ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হন।

কমিশনার হিসেবে শপথের দিন একটি কথাই নুরুন নাহার বলেছিলেন, ২৫, ২৬ ও ২৭নং ওয়ার্ডের নারীদের এবং কারখানার শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বন্ধ করাই হবে তার একমাত্র কাজ। বর্তমানে তিনি কমিশনার হিসেবে করপোরেশনের কাজের পাশাপাশি মানুষের ডাকে ছুটে যান তার নির্বাচনী ওয়ার্ডের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। কাজ করতে গিয়েই তিনি প্রথম অনুভব করেন, আমাদের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী নয়, এখানে রয়েছে অনেক আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। নারী কমিশনার হওয়ায় করপোরেশনের সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পাওয়া অবমূল্যায়ন তাকে মাঝে মাঝে আহত করে। দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতায় নুরুন নাহারের আরও একটি উপলব্ধি খুব তীব্র হয় যে, আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব সততা, যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করি না। নীতি নির্ধারণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেন না নুরুন নাহার। বুঝতে পারেন, আমাদের নীতি কাঠামোর গলদ। অনুধাবন করেন, বদলানো দরকার এই কাঠামো। আর এই নীতি কাঠামো বদলাতেই খন্দকার নুরুন নাহার আগামী দিনে গাজীপুর থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ যা স্বপ্ন, তিনি তার কাজের মাধ্যমে তা ভবিষ্যতে সে স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হবেন।

তাহমিনা খাতুনঃ নিজ যোগ্যতাবলে প্রতিষ্ঠিত এক জনপ্রতিনিধি

আশরাফুল ইসলাম সরকার

যখন সারা বিশ্বে নারীরা পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের কাছে নিষ্পেষিত– ঠিক সেই পরিস্থিতিতেও বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও নারীর দৃষ্টান্ত মূলক অগ্রগতি হচ্ছে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক। আজ নারীরা যেভাবে নিজ যোগ্যতাবলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন একের পর এক–তা সমাজের নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করতে একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, অন্যদিকে সবার অংশগ্রহণের ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রই সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজ যোগ্যতা নিয়ে যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তার উজ্জ্বল উদাহরণ রাজশাহীর মোসাঃ তাহমিনা খাতুন। জীবনে শুরু থেকে কোনো রাজনীতি না করলেও সরদহ ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য থেকে তাহমিনা খাতুন এখন রাজশাহীর চারঘাট উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান।

১৯৮৪ সালের ১০ অক্টোবর চারঘাট উপজেলার ইউসুফপুর ইউনিয়নের নাওদা পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তাহমিনা খাতুন। বাবা বাবা মোঃ নুর জামাল আলম, আর মাতা মোসাঃ তারা বেগম। পরিবারে বাবা-মা ছাড়াও তাহমিনারা তিন বোন ও দু ভাই। বাবা পেশায় ছিলেন একজন দর্জি (কাপড় সেলাই করতেন তিনি)।

১৯৮৯ সালে নাওদাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন তাহমিনা। এরপর চৌমহনী বালিকা বিদ্যালয় থেকে ২০০০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করেন। এখানেই থেমে যাওয়া নয়। নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে নিয়ে যান তিনি। কিন্তু ২০০২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের পর তার আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি।

২০০৬ সালে রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার সরদহ ইউনিয়নের আকরাম আলীর ছেলে মোঃ জিয়াউর রহমান জিয়ার সঙ্গে তাহমিনা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি খুব সহজেই শ্বশুরবাড়িতে এসে নিজেকে মানিয়ে নেন এবং সংসারের বড় বউ হিসেবে সংসারে তাকে গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়। তিনি সবকিছু সুন্দরভাবে গুছিয়ে ও সামলিয়ে নেন। কখনো কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে আলেচনা করে তা সমাধান করতেন।

২০১২ সালে ২১ নভেম্বর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও সরদহ ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমঝোতা স্মারক হয়। এর মাধ্যমে ঐ ইউনিয়ন কাজ শুরু করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। সমঝোতা স্মারকের কিছুদিন পরই তাহমিনা খাতুন রাজশাহী পোস্টাল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে (১১৮তম ব্যাচে) অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, তিনি সরদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ হাসানুজ্জামান-এর আমন্ত্রণে উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণে সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষের বৈষম্য বিষয়ক আলোচনা তার খুব ভালো লাগে। তিনি প্রশিক্ষণ থেকে শিখেন যে, সমাজে পুরুষেরা যে কাজ করতে পারবে তিনিও নারী হিসেবে সেই কাজ করার সক্ষমতা রাখেন। শুধু প্রয়োজন আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস।

প্রশিক্ষণের পরই তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে তাহমিনা দি হাঙ্গর প্রজেক্ট-এর সহযোগিতার ২০ জন নারীকে নিয়ে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ আয়োজনে ভূমিকা পালন করেন। এই সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছয় জন নারী সেলাই মেশিন ক্রয় করে বর্তমানে সেলাইয়ের কাজ করছেন, যারা প্রতি মাসে প্রায় চার হাজার টাকা আয় করেছেন।

'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণের তিনি নিজ বাড়িতে গরু, হাঁস ও মুরগী পালন শুরু করেন। তিনি এখন নিয়মিত বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করছেন, এতে তার পরিবারের সবজির চাহিদা পূরণের করছেন । তাহমিনা তার বাড়ির পাশে নিজেদের পুকুরে মাছ চাষ করে বছরে দু লাখ টাকার মাছ বিক্রি করেন, যেখানে তার খরচ হয় মাত্র ৫০ হাজার টাকা। মাঠে দু বিঘা জমিতে আমের বাগান এবং বাড়ির পাশে প্রায় তিন বিঘা জমিতে আম বাগান তৈরি করেছেন তিনি। আম বাগান হতে বছরে প্রায় দু লাখ টাকা আয় হয় তাদের। অর্থাৎ তাহমিনা তার কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার পরিবারকে। পাশাপাশি অবদান রাখছেন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে।

২০১৪ সালে ঘোষিত হয় চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল। তাহমিনা সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ জেনেছেন যে, সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাকে যোগ্য ও ক্ষমতায়িত হতে হবে। এটাই ছিল তার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার মূল উৎস। তাহমিনা নির্বাচনে প্রথমবারই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র সমর্থনে ৬৪,৮৩৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

নির্বাচিত হবার পর তাহমিনা খাতুন জেলা পরিষদের অর্থায়নে 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' গঠন করেন এবং তিনি এ ফোরাম-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়। বর্তমানে চারঘাট উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নের ১৮ জন ইউপি নারী সদস্যদের নিয়ে এই ফোরাম-এর উদ্যোগে প্রতি দু মাস পর পর সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ফোরাম-এর সদস্যরা উপজেলার নারীদের বিভিন্ন সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং করণীয় নির্ধারণ করেন। এছাড়াও তাহমিনা উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ থেকে হতদরিদ্র মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য একটি বিশেষ ফান্ড গঠন করেছেন। তিনি বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বন্ধ করার জন্য উঠান বৈঠক পরিচালনা করতে সহযোগিতা করেন। ইতোমধ্যে তাহমিনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার কারণে পাঁচটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে আমৃত্যু কাজ করে যেতে চান তাহমিনা খাতুন।

তিনি বিশ্বাস করেন, সামাজিকভাবে অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন না আসলে কখনই নারীদের জীবনে সুখময় পরিবর্তন আসে না, আসবে না। যে আত্মবিশ্বাস দিয়ে মোসাঃ তাহমিনা খাতুন তার জীবনের পরিবর্তন এনেছেন, একইভাবে সমাজের অন্যান্য নারীদের আত্মবিশ্বাসীরূপে গড়ে তুলে তাদের অবস্থার পরিবর্তনে কাজ করে যাচ্ছেন।

সমাপ্ত